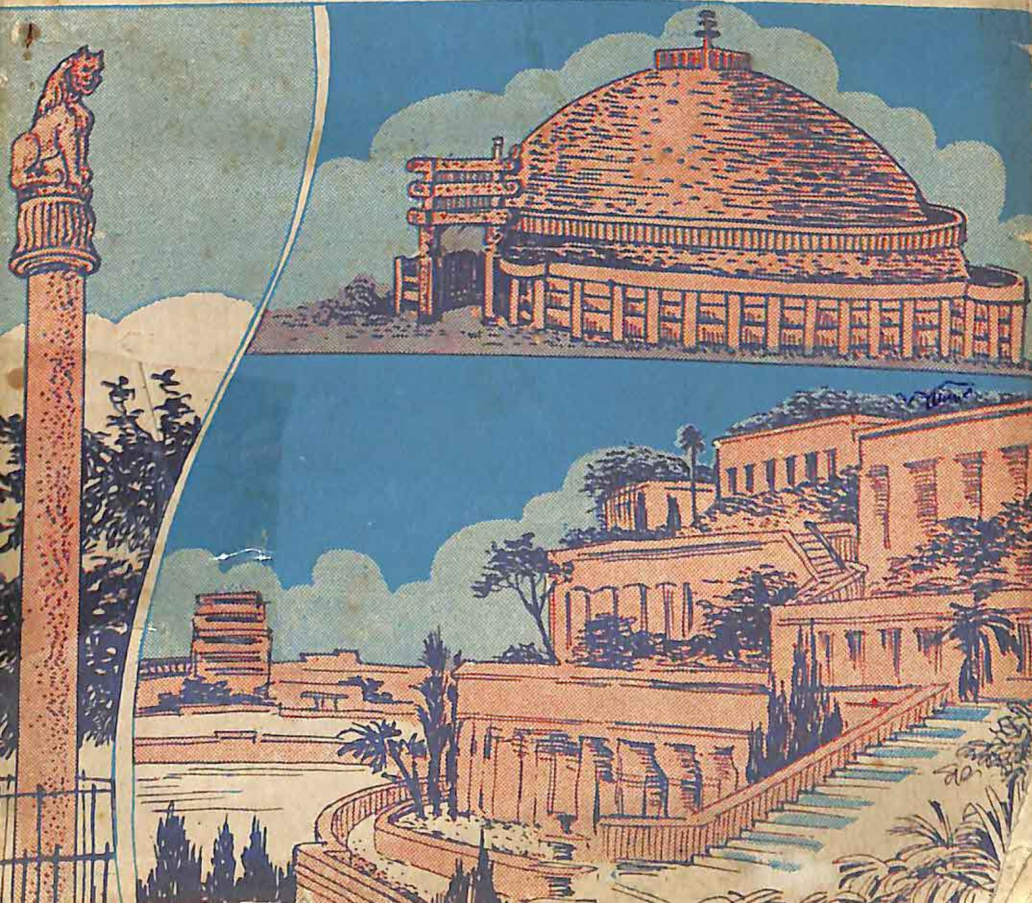


সভ্যতার ইতিকথা

[প্রাচীন যুগ]



পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রদত্ত সর্বশেষ পাঠক্রম অনুসারে ষষ্ঠ শ্রেণীর
জন্য লিখিত অবশ্য পাঠ্য ইতিহাস (১৯৭৯-'৮০)

Approved vide T. B. No. VI/H/79/130
Dt. 5.12.79

সভ্যতার ইতিকথা

[প্রাচীন যুগ]

শ্রীআশিস্ কুমার মুখোপাধ্যায়, এম, এ
ইতিহাস বিভাগের প্রধান :: বঙ্গবাসী কলেজ,
কলিকাতা

ভট্টাচার্য ব্রাদার্স
৩০/১এ, কলেজ রো :: কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক :
ভট্টাচার্য ব্রাদার্স-এর পক্ষে
শ্রীনরেশ ভট্টাচার্য

পুনর্মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩

মূল্য : সাত টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীপ্রণবেশ কুমার জানা
কমলা প্রেস
৭/৮, নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড
কলিকাতা-৭০০০১১

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

সূচনা—অন্য বিষয় যেমন-তেমন ইতিহাসের কথা উঠলেই তোমরা অনেকে ছড়া কাট—'ইতিহাসে পাতিহাঁস, ভূগোলেতে গোল।' এ ছড়া কাটার আসল উদ্দেশ্য হলো ইতিহাস ও ভূগোল সম্পর্কে অজ্ঞতা ও ভীতি প্রকাশ করা। কেন এমন হয়? ইতিহাস বলতে তোমরা বোঝ—রাজা-রাজড়ার কাহিনী, যুদ্ধ-বিগ্রহ, কতকগুলি উল্লেখযোগ্য সন-তারিখ, বিভিন্ন ঘটনাপঞ্জী আরও কত কি! তাই পরীক্ষার আগের দিন পড়া মুখস্থ করতে করতে অনেকেই হাঁপিয়ে ওঠে। অন্ধকার রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে আতঙ্কে জেগে ওঠার মত ইতিহাস-ভীতিতে ভোগে। আর তাই তারা ছড়া কেটে দায়-দায়িত্বকে এড়াবার চেষ্টা করে।

ইতিহাস মোটেই ভয় পাবার মত বিষয় নয়। মার মুখে নিজেদের ছেলেবেলার কাহিনী শুনতে কার না মজা লাগে? ঠাকুমা-দিদিমার মুখে তাঁদের কালের কথা শোনার জন্য তোমরা অনেকেই কৌতূহলী হও। ঠাকুমা-দিদিমারও আগে যাঁরা জন্মেছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে জানতে চেষ্টা কর। তাঁদের ছবি, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি দেখে তাঁদের সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে অনুমান করা সেটাও তো এক রকমের ইতিহাস। তাহলে ইতিহাসকে ভয় পাবার বিষয় ভাব কেন?

১। আমরা ইতিহাস পড়ি কেন?

বর্তমান সভ্য দুনিয়ায় বিজ্ঞানের নিত্য-নূতন আবিষ্কার উদ্ভাবন দেখে আত্মহারা হয়ে কখনও ভেব না চিরকাল এমনি ধারাই ছিল। তাই সবার আগে তোমাদের জানতে হবে, পৃথিবী আর মানুষের সৃষ্টি হলো কিভাবে? সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী সহ আরও আটটি (মতান্তরে নয়টি) গ্রহ নিয়ে সৌর-পরিবার গড়ে উঠেছে। সূর্যের সঙ্গে কোন একটি শক্তিশালী

নক্ষত্রের সংঘর্ষে একদা জন্ম নিয়েছিল এই পৃথিবী। সেদিন পৃথিবী ছিল উত্তপ্ত। পরে শীতল হয় ও জীবজগতের জীবনধারনের উপযোগী হয়ে ওঠে। এই পৃথিবীর প্রথম প্রাণী—এককোষী জীব অ্যামিবা, তারপর স্থলচর—স্তন্যপায়ী, উভচর ও অতিকায় শ্রেণীর আবির্ভাব এবং সবশেষে বানরজাতীয় প্রাণীর উদ্ভব থেকে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মনুষ্য জাতির সৃষ্টি। এরপর আদিম বর্বর জীবন পার হয়ে মানুষ ধীরে ধীরে সভ্য জীবনের পথে পদক্ষেপ করল। সুতরাং এইভাবে পৃথিবীতে মানুষ আসার কাহিনী লক্ষ কোটি বছরের ব্যাপার। এর পরের পর্যায়ে প্রকৃতির হাতে অসহায় মানুষের এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য একটানা সংগ্রাম ও প্রতিকূল অবস্থাকে জয় করার কাহিনী নিয়েই গড়ে উঠেছে মানুষের ইতিহাস। সেই দীর্ঘ কয়েক লক্ষ বৎসরের বিবর্তনের কাহিনী জানার জন্যই আমরা ইতিহাস পড়ি। **ইতিহাস তাই সমগ্র মানব জাতি ও তার সৃষ্ট সভ্যতার ধারাবাহিক বিবর্তনের পরিচয় দেয়।**

প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ অনুযায়ী মানুষের জীবনধারায় বৈচিত্র্য ঘটেছে। সৃষ্টি হয়েছে নানা জাতি, নানা ভাষা ও নানা মত। তথাপি বলা যায়, পৃথিবীতে একটি জাতিই আছে—তার নাম মানব জাতি। মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতিতে পার্থক্য ঘটলেও অন্তরে অন্তরে সেটা কিন্তু এক। সেজন্যই **সমগ্র মানব জাতির নিরবিচ্ছিন্ন জয়যাত্রার উপভোগ্য ও কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনী জানার তাগিদেই আমরা পড়ি তার অতীত কাহিনী, যার আর এক নাম ইতিহাস।**

২। প্রাচীন যুগের মানুষকে কিভাবে জানা যায় :

কবি তাঁর কল্পনা দিয়ে অতীতকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন। শিল্পী তাঁর তুলি আর মনের মাধুরী মিশিয়ে ছবি এঁকেছেন। আর ঐতিহাসিক? পাকা শিকারীর মত অতীতের অরণ্যে নানা তথ্যের সন্ধানে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কিছুটা সত্য ইতিহাস আর কিছুটা অনুমানের ওপর নির্ভর করে জানবার চেষ্টা করেছেন, সেই বিলীয়মান অতীতের মানব সভ্যতা ও তার ধারাবাহিক ক্রমোন্নতির

ইতিহাস। তোমরা এযুগে ছাপাখানার দৌলতে কত রকমারি বিষয়ের বই পড়। সেযুগে লেখার চলন ছিল না। আর যাও নিদর্শন পাওয়া গেছে—তা নিছক সংকেতলিপি মাত্র।

তবে সেযুগের মানুষের ব্যবহার করা অস্ত্রশস্ত্র, মৃৎপাত্র ইত্যাদি নিদর্শন থেকেও সেই সুদূর প্রাচীন যুগের কথা জানা যায়। অবশ্য এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকের সহযোগী হয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক আর পুরাতাত্ত্বিকেরা।

প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মাটির তলায় খননকার্য চালিয়ে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভগ্নস্তূপ আবিস্কারের চেষ্টা করেছেন। সেজন্যই সম্ভব হয়েছে সুমেরীয়-মিশরীয়-সিন্ধু-চীনা সভ্যতার মত প্রাচীন সভ্যতাগুলি সম্বন্ধে নানান তথ্য সংগ্রহ করা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে পাঞ্জাবে সিন্ধু নদের উপনদী রাভি (ইরাবতী)-র তীরে হরপ্পা ও সিন্ধু নদের তীরে মহেঞ্জোদড়ো দুটি স্থানের কথা। এখানকার মাটি খুঁড়ে প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। তার মধ্যে—সীলমোহর, নারী ও পুরুষ মূর্তি, স্নানাগার, নর্দমা, শস্য মজুত রাখার জন্য গোলাঘর, দোতলা-তিনতলা বাড়ীর ভগ্নাবশেষ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

নৃতাত্ত্বিকেরা পাথরের গায়ে শিলীভূত জীবজন্তুর কঙ্কাল, মানুষের হাড়গোড় ইত্যাদি নিদর্শনের সাহায্যে প্রাচীন মানব জাতি ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে কি কি পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছিল—সেটা সম্পর্কে অনেক কিছু অজানা রহস্যের সন্ধান দিয়েছেন। অস্ট্রিক, ককেশীয় মঙ্গোলীয় ও নিগ্রোবটু নামে চারটি আদিম মানবগোষ্ঠী পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থান ক'রে ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থার প্রভাবে কিরূপ ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছে তার কথাও নৃতাত্ত্বিকেরা জানিয়েছেন।

পুরাতাত্ত্বিকেরা অতীত ঐতিহ্য, প্রচলিত ধর্মীয় কাহিনী ও বিভিন্ন সাংকেতিক লিপির সাহায্যে প্রাচীন ইতিহাসের কালানুক্রমিক রূপান্তরের পরিচয় দিয়েছেন। এমনি করেই সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে

প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের বহু চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর বিষয়ের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র স্থাপন। ইতিহাস তাই এখন আর আমাদের কাছে মোটেই বিভীষিকা নয়; বরং তা আনন্দদায়ক ও কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়।

অনুশীলনী

[ক] বড় প্রশ্ন

১। ইতিহাস বলতে কি বোঝ?

২। ইতিহাস পড়ার কথা উঠলে তোমরা ছড়া কাট কেন?

৩। আমরা ইতিহাস পড়ি কেন?

৪। প্রাচীন যুগের ইতিহাস কেমন করে জানা যায়?

[খ] ছোট প্রশ্ন

১। ইতিহাস মোটেই ভয় পাবার বিষয় নয় কেন?

২। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা কি করেন?

৩। নৃতাত্ত্বিকেরা আমাদের কি কি জানিয়েছেন?

[গ] বুদ্ধির প্রশ্ন

১। ভুল উক্তিগুলি শুদ্ধ করে লেখ:

(ক) নৃতাত্ত্বিকেরা মাটির তলায় খনন কার্য চালান। (খ) প্রত্নতাত্ত্বিকেরা জীবজন্তুর কঙ্কাল, মানুষের হাড়গোড় দেখে গবেষণা করেন। (গ) পৃথিবীতে প্রথম যে প্রাণের আবির্ভাব হয় তা হলো মানুষ।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) সবশেষে——প্রাণীর উদ্ভব থেকে নানা——মধ্য দিয়ে——জাতির সৃষ্টি। (খ) ইতিহাস তাই সমগ্র——ও তার সৃষ্ট সভ্যতার——বিবর্তনের পরিচয় দেয়। (গ) ইতিহাস তাই এখন আর আমাদের কাছে মোটেই—— নয় বরং তা——ও কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়।

[ঘ] মৌখিক প্রশ্ন

(ক) কেমন করে পৃথিবীর সৃষ্টি হলো? (খ) ইতিহাস কিসের পরিচয় দেয়? (গ) কেমন করে মানুষের জীবনধারায় বৈচিত্র্য ঘটেছে?

দ্বিতীয় অধ্যায় | আদিম মানুষের কথা

সূচনা—তোমরা যেমন আস্তে আস্তে বড় হয়েছ—মায়ের কোল থেকে নেমে হামাগুড়ি দেবার পরে হাঁটতে শিখেছ—মানুষের ইতিহাসের আদিম পর্যায়ের কাহিনীও অনেকটা সে-রকমের। পৃথিবীর জন্মের পরের পর্যায়ে প্রকৃতির পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে একে একে এল এককোষী জীব, স্থলচর জীব, স্তন্যপায়ী জীব এবং সবশেষে এল বানর ও মনুষ্যজাতীয় জীব। এইভাবেই কেটে গেছে বেশ কয়েক লক্ষ কোটি বছর।

বানর আর মানুষ এ দুয়ের আকৃতি-প্রকৃতিতে সর্বদিক থেকে না হলেও কিছু কিছু মিল আছে। যেমন ধর; বানর আর মানুষের মাথার খুলি, চোয়াল ইত্যাদি অনেকটা প্রায় একই রকমের। কিন্তু মানুষের মাথায় যে মগজ আছে—সেটা বানরের নেই। আর মগজ থাকার জন্য মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিতে হয়েছে **সর্বশ্রেষ্ঠ জীব।**

বেশ কয়েক লক্ষ বছরের কিছু কিছু নিদর্শন বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন। জার্মানীর হিদেলবার্গ ও নিয়ানডারথাল, জাভা, চীনের পিকিঙে বানর ও মানুষের প্রায় সম-পর্যায়ের জীবের কঙ্কাল, মাথার খুলি, চোয়াল, হাড়গোড় এবং কিছু কিছু পাথরের অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সেসব নিদর্শন থেকে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন, বানর-মানুষ থেকে সত্যিকারের মানুষের উদ্ভবকালের মধ্যে বেশ কয়েক লক্ষ বছরের ব্যবধান। আমাদের পূর্বপুরুষ—সত্যিকারের মানুষের আবির্ভাব হয়েছে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ হাজার বছর আগে। তথাপি মানবজাতির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসে বানর-মানুষের পর্যায়ের গুরুত্ব অসামান্য। ঐসব বানর-মানুষদের সম্বন্ধে পাওয়া নিদর্শনগুলির মধ্যে পিকিঙের গুহামানবের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১। পিকিঙের গুহামানব ঃ

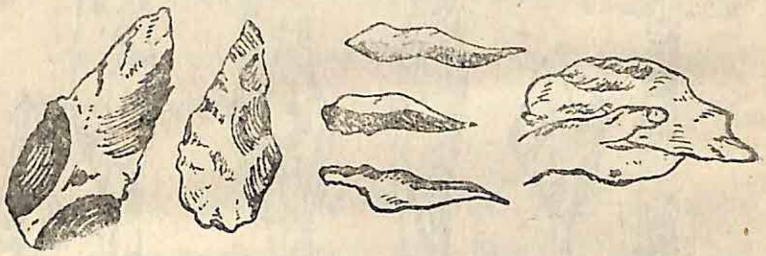
পিকিঙ কোথায় জান ? আমাদের প্রতিবেশী দেশ—প্রজাতন্ত্রী চীন। তারই রাজধানী হল পিকিঙ। ১৯২৭ সালে সেই নামে একজন চৈনিক প্রত্নতাত্ত্বিক মাটির তলায় খননকার্য চালিয়ে প্রায় তিন লক্ষ বছর পূর্বেকার নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন। চীনের রাজধানী পিকিঙের কাছাকাছি চাউকাউতিয়েন নামক স্থানের একটি গুহায় বানর-মানুষ সম্বন্ধে অনেক অজানা রহস্যের সন্ধান পাওয়া গেছে বলে এদের নামকরণ করা হয়েছে পিকিঙের গুহামানব। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এদের নামকরণ করেছেন 'সিনানথ্রোপাস' —যার অর্থ হল 'চীনের বানর-মানুষ'। এখানে পাওয়া গেছে বানর-মানুষের হাড়গোড়, পাথরের অস্ত্রশস্ত্র, ছাই এবং জীবজন্তুর হাড়ের স্তর।

আগুনের ব্যবহার ও খাদ্য সংগ্রহ—পণ্ডিতেরা উপরে উল্লিখিত নিদর্শন থেকে অনুমান করেছেন যে, পিকিঙের গুহামানব আগুনের ব্যবহার জানত। বোধ হয় তারা পাথরে পাথরে ঠুকে আগুন জ্বালাতে পারত। খুব সম্ভব ইঁদুর, ছুঁচো জাতীয় জন্তু শিকার করে পুড়িয়ে খেত। এদের মুখের গঠন ছিল বিচিত্র রকমের ; পুরুষদের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ১৬৩ সেণ্টিমিটার এবং স্ত্রীলোকেরা ছিল ১৫২ সেণ্টিমিটার লম্বা। এরা পায়ের ওপর ভর দিয়ে চললেও কিছুটা কুঁজো হয়ে হাটত। পিকিঙের গুহামানবদের আবির্ভাবের সময়কাল (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব তিন লক্ষ বছর) থেকে আদিমতম মনুষ্যসমাজের ইতিহাসের যাত্রা শুরু হয়। তাই পিকিঙের গুহামানবের আবির্ভাবের সময়কাল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সেইজন্যই এই সময়কালকে বলা হয়েছে 'অ্যানথ্রোপোজেনিক' যার অর্থ পৃথিবীতে মানুষের জন্ম বা আবির্ভাবের কাল।

২। পুরানো পাথরের যুগ ঃ

প্রায় বিশ-পঁচিশ হাজার বছর আগের কথা। বানর-মানুষ তখন অর্ধেক মানুষ আর অর্ধেক বানরাকৃতি নেই। মেরুদণ্ড সোজা করে হাঁটতে শিখেছে। তার চারদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হিংস্র জন্তু আর

গাছপালা। এই পৃথিবীতে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার জন্য দুটি হাত তার যথেষ্ট নয়। হাত দুটির সাহায্যে আরও বেশি কাজ করা চলে এমন অস্ত্রের প্রয়োজন হলো। হাতের কাছে ছিল জড়ো করা পাথর আর গাছপালা। চারদিকে ছিল বিরাট বিরাট সব জন্তু-জানোয়ার। বেঁচে থাকার জন্য পশুর কাঁচা মাংস আর ফলমূল ছিল ওদের আহার্য। পশু শিকারের জন্য আদিম মানুষ



পুরানো পাথরের যুগের অস্ত্রশস্ত্র

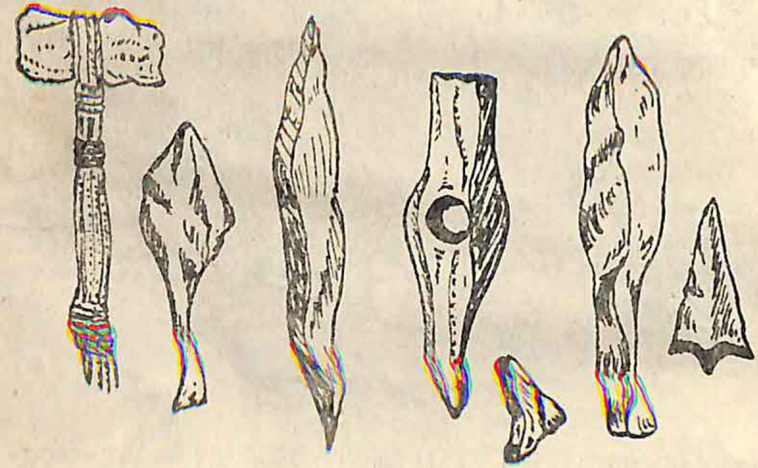
তৈরী করল পাথরের অস্ত্র বা হাতিয়ার। প্রথমে সেগুলি ছিল এবড়ো-খেবড়ো। এই এবড়ো-খেবড়ো পাথরের অস্ত্র ব্যবহারকারী আদিম মানুষের জীবনধারাকে বলা হয় **পুরানো পাথরের যুগ**।

পুরানো পাথরের যুগের মানুষ আগুনের ব্যবহার জানত না। তাই পশুর কাঁচা মাংস খেত। কখনও কখনও নরমাংসও খেত। ওদের বাসস্থান ছিল গাছের কোটর কিংবা পাহাড়ের গুহা। ওরা উলঙ্গ হয়ে থাকত। কারণ বস্ত্রের ব্যবহার ওদের অজানা ছিল। যখন কোন অতিকায় পশু ঘুমিয়ে থাকত তখন ওরা বুদ্ধি করে বড় বড় পাথরের চাঁই তাদের গায়ে ফেলে দিত। খুব সম্ভব এরা তীর-ধনুকের ব্যবহার জানত। কখনও বা পশু শিকার করতে গিয়ে নিজেরাই পশুর আহার্য হতো।

৩। নতুন পাথরের যুগ :

পুরানো পাথরের যুগের প্রায় শেষ ভাগ থেকেই আদিম মানুষ নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারল পাথরের অসমান অস্ত্র হাতিয়ার হিসাবে যথেষ্ট নয়। তাই তারা পাথরটা ঘষে মেজে বেশ করে

ছুঁচালো করে তুলল। আনুমানিক আট হাজার খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে এসে পুরানো পাথরের যুগের মানুষ পদার্পণ করল নতুন পাথরের যুগে। তারা এ সময়ে মসৃণ ও ছুঁচালো পাথরের অস্ত্র তৈরী করতে শিখল। তার একটি দিক ছেঁদা করে জীবজন্তুর হাড় কিংবা গাছের ডাল দিয়ে হাতল তৈরী করে নিল।



নতুন পাথরের যুগের অস্ত্রশস্ত্র

তারপর তাই নিয়ে চলল শিকারে। এখন আর তারা পশুর কাঁচা মাংস খায় না। পাথরে পাথরে ঠুকে তারা আগুন জ্বালিয়ে তাতে পশুর মাংস আর মাছ ঝলসে খেতে অভ্যস্ত হলো। এ ছাড়া তাদের আহার্য ছিল গাছের ফলমূল।

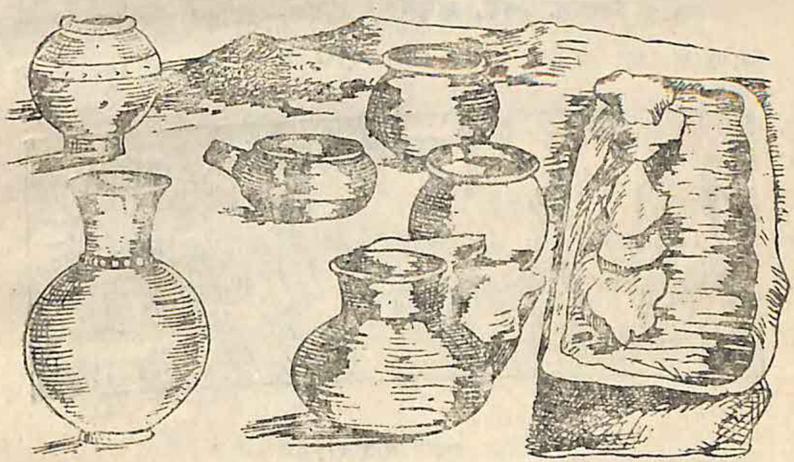
খাদ্য সংগ্রহ—নতুন পাথরের যুগের মানুষ খাদ্য সংগ্রহের দিক থেকে এখন আর গাছের ফলমূল, জীবজন্তুর মাংস কিংবা মাছ পেয়েই সন্তুষ্ট রইল না। তারা খাদ্য সংগ্রহ করার দিক থেকেও এক অভিনব আবিষ্কার করল। সেটা হল কৃষির আবিষ্কার। পুরুষেরা শিকারে বেরুত, আর মেয়েরা ব্যস্ত থাকত ফলমূল সংগ্রহের কাজে। মেয়েরা লক্ষ্য করল এক ধরনের গাছে বিচিত্র জিনিস ফলে। সেগুলি খেয়ে দেখল তাতে উদর পূরণ চলে। এমনি ভাবেই এল কৃষি। কৃষির আবিষ্কার নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। হয়ত-বা আপনা-আপনি ধান,

যব জাতীয় খাদ্যশস্যের গাছ জন্মাত। সেগুলির অস্তিত্ব যেদিন আবিস্কৃত হলো—সেদিন থেকেই আদিম মানুষ মেতে গেল চাষবাসের কাজে। কৃষির আবিষ্কার আদিম মানুষের ছন্নছাড়া বাউন্ডুলে জীবন-ধারায় এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন বয়ে আনল। তার প্রভাবেই খাদ্য উৎপাদন, স্থায়িত্ব, জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা বিধানের আগ্রহ ধীরে ধীরে ক্রমবিকশিত হয়ে উঠতে লাগল।

৪। নতুন পাথরের যুগে বিস্ময়কর পরিবর্তন :

পূর্বেই বলা হয়েছে, কৃষির আবিস্কার নতুন পাথরের যুগের মানুষের জীবনধারায় এনেছে স্থায়িত্ব। আর সেজন্যই এই সময়ে কতকগুলি বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে।

পশুপালন, মৃৎপাত্র, বস্ত্র ও বাসগৃহ নির্মাণ—পশুপালনের সূচনা এই সময় থেকেই শুরু হয়। আদিম মানুষ এবার চাষবাসের জন্য গরু, মোষ, ভেড়া জাতীয় জন্তুকেও কাজে লাগাতে শুরু করল। ঐগুলি ভার বহনের কাজেও অপরিহার্য হলো। তাছাড়া, পশুর দুধ জলীয়



মৃৎ-পাত্রের নমুনা

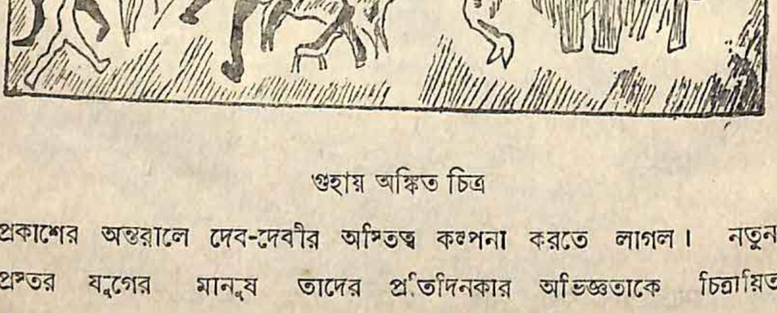
খাদ্য হিসেবে পান করা যায়। সেজন্য পশুপালনকে অনেকেই পেশা হিসাবে বেছে নিল।

মাটির পাত্র তৈরী করা ও খাদ্যদ্রব্য রান্না করে খাওয়ার ব্যবস্থা এই সময়েই শুরু হয়। গাছের বাকল কিংবা পশুর চামড়া তারা পরত। এখন তারা কাপড় বুনতে শিখল।

বন্যজন্তুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণে লেগে গেল। ঘর তৈরী করে তার চারদিকে বেড়া দিয়ে বাসস্থানকে নিরাপদ করে তুলল। কখনও বা নদী এবং জলাশয়ের ওপর বড় বড় গাছের খুঁটি পুঁতে ঘর বাঁধল। জলাশয়ের ওপর নির্মিত এ জাতীয় বাসস্থানকে বলে **হ্রদ-বসতি**। ইউরোপ মহাদেশের অন্তর্গত নিউজিল্যাণ্ডে এ জাতীয় হ্রদ-বসতির নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে।

নতুন বাসগৃহ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের ব্যবহৃত গুহাকে কিভাবে নিরাপদ বাসস্থানে পরিণত করা যায় তারও প্রচেষ্টা চলল। অন্যদিকে, যানবাহন ও ভারীদ্রব্য বহনের ক্ষেত্রে গরু, ভেড়া, মোষ জাতীয় জন্তুগুলিকে কাজে লাগান হলো। বহু পরিবার একই সঙ্গে থাকায় নদী বা হ্রদের তীরে গ্রাম গড়ে উঠতে লাগল।

ধর্মীয় বিশ্বাস, শিল্প, ভাবের বাহন—প্রকৃতির ভয়াল রূপে দিশেহারা হয়ে আদিম মানুষ রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড়ের মত প্রকৃতির বিভিন্ন



গুহায় অঙ্কিত চিত্র

প্রকাশের অন্তরালে দেব-দেবীর অস্তিত্ব কল্পনা করতে লাগল। নতুন প্রস্তর যুগের মানুষ তাদের প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতাকে চিত্রায়িত করে তুলত বিভিন্ন গুহায়। গুহায় অংকিত চিত্রগুলি নতুন পাথরের

যুগের মানুষের শিল্প ও রুচিবোধের পরিচায়ক। অন্যদিকে মনের ভাব প্রকাশের জন্য ব্যাকুলতার পরিচয়ও গুহায় আঁকা ছবিগুলিতে পাওয়া যায়। স্পেনের আলতেমিয়া গুহায় আঁকা জীবজন্তুর ছবি পাওয়া গেছে। সেগুলি আদিম মানুষের চিত্রাঙ্কণ দক্ষতার পরিচায়ক।

উৎপাদক দেবতার বন্দনা—উৎপাদন বলতে বোঝায় নতুন কিছু তৈরী করা। নতুন পাথরের যুগের মানুষ চাষবাস করতে গিয়ে দেখল অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি এই দুই-ই সমানভাবে ক্ষতিকর। তাই অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির অন্তরালে তারা দেব-দেবীর অস্তিত্ব কল্পনা করত। ভাবত, দেবতা বোধ হয় অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই দেব-দেবীকে প্রসন্ন করার জন্য তারা জীবজন্তু বলি দিত। এমন কি নরবলি দিতেও দ্বিধা-বোধ করত না। অন্যদিকে ধর্মের বিধানদানকারী পুরোহিত সম্প্রদায়ের উদ্ভব এ যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এক কথায় বলা চলে, নতুন পাথরের যুগে এসে মানুষ যথার্থ সভ্যতার পথে পা বাড়ালো।

অনুশীলনী

[ক] বড় প্রশ্ন

১। পৃথিবীর সৃষ্টির পরবর্তী পর্যায়ে কিভাবে মানুষের আবির্ভাব ঘটল কম কথায় তার আলোচনা কর।

২। পিকিঙের গুহামানব সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৩। পুরানো পাথরের যুগের মানুষের পরিচয় দাও।

৪। নতুন পাথরের যুগের মানুষদের সম্বন্ধে কি জান?

৫। নতুন পাথরের যুগে কি কি বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছিল?

[খ] সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বানর ও মানুষের মধ্যে কি কি মিল ও অমিল আছে?

২। বানর-মানুষ বলতে কি বোঝ?

৩। পুরানো পাথরের যুগের মানুষ কেমন করে শিকার করতো?

৪। কৃষির আবিষ্কার কখন কিভাবে হলো?

৫। নতুন পাথরের যুগের মানুষের বাসস্থান সম্বন্ধে কি জান?

[গ] বুদ্ধির প্রশ্ন

১। শূন্যস্থান পূরণ কর।

(ক) মগজ থাকার জন্য মানুষ — হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। (খ) আমাদের প্রতিবেশী দেশ প্রজাতন্ত্রী —। (গ) পশু শিকারের জন্য — মানুষ তৈরী করল পাথরের — বা —। (ঘ) — আবিষ্কার নিঃসন্দেহে এক — আবিষ্কার।

২। ভুল উক্তিগুলিকে শুদ্ধ করে লেখ।

(ক) বানর আর মানুষ দুয়েরই মগজ আছে। তাই তারা বুদ্ধিবৃত্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। (খ) পুরানো পাথরের যুগের মানুষের স্থায়ী বাসস্থান ছিল। (গ) নতুন পাথরের যুগের মানুষের অস্ত্রশস্ত্র ছিল এবড়ো-খেবড়ো পাথরের তৈরী। (ঘ) নতুন পাথরের যুগেও কৃষির আবিষ্কার সম্ভব হয়নি।

[ঘ] মৌখিক প্রশ্ন

(ক) পিকিঙের গুহামানব কাদের বলা হয়? (খ) কোন্ প্রত্নতাত্ত্বিকের তত্ত্বাবধানে পিকিঙের গুহামানবদের সম্বন্ধে জানা সম্ভব হয়েছে? (গ) হাতিয়ার বলতে কি বোঝ? (ঘ) নতুন পাথরের যুগের মানুষের যুগান্তকারী আবিষ্কার কি? (ঙ) বাসস্থান নির্মাণের প্রয়োজন কখন থেকে দেখা দিল? (চ) অতি বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হলে আদিম মানুষেরা কি ভাবত? (ছ) নরবলি প্রথা কোন্ যুগে চালু হয়েছিল ও কেন হয়েছিল?

সূচনা—একদিন আদিম মানুষ নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারল পাথরের অস্ত্রশস্ত্র বা মাটির বাসন-কোসন আর যথেষ্ট নয়। প্রতিকূল অবস্থাকে জয় করার আগ্রহে তাই তারা প্রকৃতির রত্নভাণ্ডার থেকে ছিনিয়ে আনল তামা, ব্রোঞ্জ, সোনা, রুপা আরও কত কি ধাতু। সবচেয়ে আগে আবিষ্কৃত হয়েছে তামা। তারপর তামা ও টিন মিশিয়ে আদিম মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে তৈরী করেছে ব্রোঞ্জ। অবশ্য এর পাশাপাশি চলছিল নতুন পাথরের যুগের মসৃণ ও ধারালো পাথরের অস্ত্রের ব্যবহার। নতুন পাথরের যুগের পরবর্তী পর্যায়ে প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগে তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার শুরু হয় বলে আদিম ইতিহাসের সেই পর্যায়কে আখ্যা দেওয়া হয়েছে **তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ**। এই সময়ে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা সেইসব রূপান্তরের ধারাবাহিক পরিচয় দেবার চেষ্টা করব।

১। নগরের উদ্ভব ও উৎপাদন পদ্ধতির রূপান্তর ঃ

নতুন পাথরের যুগের আদিম মানুষ জন্তু-জানোয়ারের ভয়ে দলবদ্ধ হয়ে গ্রামে বাস করত। তখন প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি ও পশুপালন। সেদিক থেকে গ্রামই ছিল যথেষ্ট। কিন্তু ধাতুর ব্যবহার শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র ও নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র তৈরী করতে লাগল। আগে থেকেই চাষ ও পশুপালন চলছিল। এভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমাজে এল জটিলতা। উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের ফলে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এই সময়ে নগরের উদ্ভব হল। এইভাবে গ্রামে ও নগরে ভিন্ন ভিন্ন জীবনধারা বইতে লাগল। খাদ্যশস্যের জন্য নগরের মানুষ রইল গ্রামের মুখাপেক্ষী। অন্যদিকে গ্রামের মানুষ উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র

কেনার জন্য নগরের উপর নির্ভর করতে লাগল। এইভাবেই আদিম যুগ থেকেই গ্রাম ও নগরের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক গড়ে উঠল।

কারিগরি দক্ষতা ও ব্যবসা-বাণিজ্য—একদল লোক তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়ে নানা রকম জিনিস তৈরী করে অল্পদিনেই সুদক্ষ কারিগর হয়ে উঠল। তাদের নির্মিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য গড়ে উঠল বাজার। গ্রামের চাষীও এল তার খাদ্যশস্য নিয়ে বাজারে বিক্রি করার জন্য। একদল লোক পুরোপুরি কেনা-বেচার কাজে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। পরবর্তীকালে এরাই ব্যবসায়ী রূপে সমাজে পরিচিত হলো।

প্রথমে ব্যবসা চলত প্রত্যক্ষ বিনিময়ের মাধ্যমে। যেমন, চালের বদলে মাটির বাসন, আবার মাটির বাসনের বিনিময়ে তামার জিনিস। কিন্তু প্রত্যক্ষ বিনিময় প্রথায় খুবই অসুবিধার সৃষ্টি হয়। চাষী চাল দিতে চায় অথচ কারিগর বললে—'না, বাপু, আমার চাল চাই না।' ব্যবসায়ীদের উদ্ভবের ফলে প্রত্যক্ষ বিনিময়ের অসুবিধা দূর হল। ব্যবসাক্ষেত্রে কড়ি কিংবা মূল্যবান ধাতবখন্ডকে বিনিময়ের মাধ্যম করে পরোক্ষ বিনিময় ব্যবস্থা চালু হলো।

২। সামাজিক জীবনধারার ক্রমবিকাশঃ

সমাজে আগে ছিল চাষী ও পশুপালক। এবার এল কুমার, কারিগর এবং ব্যবসায়ী। এর ফলে গ্রাম ও নগরে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অনুযায়ী সমাজ জীবনেরও বেশ কিছুটা রূপান্তর ঘটল। জীবনধারায় দেখা দিল এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। একদল লোক ব্যবসা-বাণিজ্য বা চাষবাস করে অল্প-দিনের মধ্যে বিত্তশালী হয়ে উঠল। আর এক দলের চাষের জমি নেই, ব্যবসা কিংবা কারিগরি কোনদিক থেকেই তারা বিশেষ সুবিধে করতে পারল না। ক্রমশঃ এরা নিঃস্ব ও রিক্ত হতে লাগল। এইভাবেই সেই আদিম যুগ থেকেই সমাজে ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। একদল মানুষ অন্যকে শোষণ করে ফুলে ফেঁপে ওঠে। আরেক দল বেগার খাটে, পেট পুরে খেতে পায় না। পরবর্তীকালে ধনী-দরিদ্র—শোষক-

শোষিতের মধ্যে সংঘাতই মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসে প্রধান হয়ে দেখা দিল।

শ্রেণী, গোষ্ঠী সংঘাত ও আদিম রাষ্ট্রের প্রসার—কৃষির আবিষ্কার, স্থায়ী বাসস্থান, বিত্তশালী ও বিত্তহীন শ্রেণীর উদ্ভব প্রভৃতির ফলে সমাজে প্রধানতঃ দুটি শ্রেণী দেখা দিল – ধনী আর দরিদ্র। অন্যভাবে বললে— শোষক আর শোষিত।

রক্তের সম্পর্ক সূত্রে উৎসগত দিক থেকে এক এবং একই অঞ্চলে বাসিন্দাদের বলা হতো গোষ্ঠী। হয়ত একই পরিবারের সদস্য সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এক সময়ে তা ভেঙে টুকরো হয়ে গেল। কিন্তু রক্তের সম্পর্ক সূত্রে ঐক্য বজায় রইল। প্রথমে জন্তু-জানোয়ারের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য একই গোষ্ঠীর লোকেরা দলবদ্ধ হয়ে কোন বিশেষ অঞ্চলে বাস করত। কিন্তু জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সংগে একই গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ তীব্র হয়ে ওঠে। অন্যদিকে অন্য গোষ্ঠীগুলি চাষের উপযোগী জমি বা সমৃদ্ধ জীবনধারার তাগিদে সংঘাতে লিপ্ত হলো।

একই গোষ্ঠীর মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব জটিলতা এবং অন্য গোষ্ঠীর সংগে সংঘাত সত্ত্বেও তখন থেকেই এক আদিম রাষ্ট্রের সম্ভাবনা দেখা দিল। কারণ একটি গোষ্ঠীর মধ্যে বয়সে যিনি সবচেয়ে বেশি প্রবীণ ও প্রধান তাঁকে সবাই সম্মান, শ্রদ্ধা ও মান্যগণ্য করে এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে চলে। ইনিই হলেন **গোষ্ঠীর প্রধান বা গোষ্ঠীপতি**। তিনি সকলের বুদ্ধি-পরামর্শের বিশেষ মর্যাদা দেন। অন্যদের সঙ্গে আলোচনা না করে কখনও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হন না। সমাজের শীর্ষস্থানে আসীন গোষ্ঠীপতি কখনও স্বেচ্ছাচারী হবার চেষ্টা করতেন না। সকলের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় অনুযায়ী তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। এইভাবেই আধুনিক রাষ্ট্রের সম্ভাবনা সেই আদিম যুগেই বীজ আকারে দেখা দিয়েছিল।

প্রাচীন সভ্যতাগুলি কেন নদীর ওপর নির্ভরশীল ছিল—প্রাচীন কালের লুপ্ত সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গেছে মিশর, সুমের, ভারত ও চীন দেশে। এই প্রাচীন সভ্যতাগুলি ছিল নদীর ওপর নির্ভরশীল।

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের এসব প্রাচীন সভ্যতাগুলির নদী নির্ভরতার অনেকগুলি কারণ ছিল।

প্রথমতঃ, জলের আর এক নাম জীবন। নদীর জলে শুধু মানুষ নয় পশুদেরও তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ, নদীর পলিতে মৃত্তিকা হতো সরস। তাছাড়া, বন্যার সময় জল আটকে রাখার জন্য বাঁধ দেওয়া হতো। ছোট খাল কেটে বাঁধের সঞ্চিত জল কৃষিক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হতো। এর ফলে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হতো। সেজন্য প্রত্যেকেই দু'বেলা পেট পুরে খেতে পেত। তৃতীয়তঃ, নদীতীরের আবহাওয়া ছিল নাতি-শীতোষ্ণ ও স্বাস্থ্যকর। সেখানে কৃষিকাজ ও পশুপালন দুয়েরই সুবিধে ছিল। সেজন্যই নদীতীরে লোকবসতি গড়ে ওঠে। চতুর্থতঃ, নদীতীরেই প্রথম তামার সন্ধান মেলে। এসব কারণেই প্রাচীন যুগের সভ্যতাগুলির সূচনা হয় নদীতীরে। সেজন্যই নদীকে দেব-দেবী জ্ঞানে বন্দনার রীতি সেই আদিম যুগ থেকেই শুরু হয়। আজও যখন আমরা 'গংগা মাঈকি ধ্বনি' শুনি তখন নদীমাতৃক প্রাচীন সভ্যতার কথাই বার বার মনে পড়ে।

অনুশীলনী

[ক] বড় প্রশ্ন

১। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ বলতে কি বোঝ? এই যুগে নগরের উদ্ভব ও উৎপাদন পদ্ধতির রূপান্তর কিভাবে ঘটল?

২। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে কারিগরি দক্ষতা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩। প্রাচীন সভ্যতা নদীর ওপর নির্ভরশীল কেন ছিল?

[খ] ছোট প্রশ্ন

১। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে কিভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হয়?

২। আদিম রাষ্ট্রের সম্ভাবনা কেমন করে দেখা দেয়?

৩। ইতিহাসে কেমন করে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের সূচনা হয়?

[গ] বুদ্ধির প্রশ্ন

১। পাশে 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' লিখে উত্তর দাও ঃ

(ক) প্রাচীনকালে গ্রামে ও নগরে একই রকমের জীবনধারা বইত। (খ) প্রথম যে ধাতুর আবিষ্কার হয় তা হলো তামা। (গ) নদী তীরে কেবল মাত্র পশুচারণই চলত।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) প্রথমে ব্যবসা চলত প্রত্যক্ষ—মাধ্যমে। (খ) ব্যবসাক্ষেত্রে—কিংবা মূল্যবান—বিনিময়ের মাধ্যম করে পরোক্ষ—ব্যবস্থা চালু হলো। (গ) সমাজের শীর্ষস্থানে আসীন—কখনও স্বেচ্ছাচারী হবার চেষ্টা করতেন না। (ঘ) এই প্রাচীন সভ্যতাগুলি ছিল— ওপর নির্ভরশীল। (ঙ) —দেব-দেবী জ্ঞানে বন্দনার রীতি সেই আদি যুগ থেকেই শুরু হয়।

[ঘ] মৌখিক প্রশ্ন

(ক) আদিম মানুষ প্রথম কি ধাতু আবিষ্কার করে? (খ) ব্রোঞ্জ কি কি দিয়ে তৈরী? (গ) গোষ্ঠীপতি কাদের বলা হতো? (ঘ) 'গঙ্গামাঈ কি জয়' ধ্বনি শুনলে আমাদের কি মনে হয়?

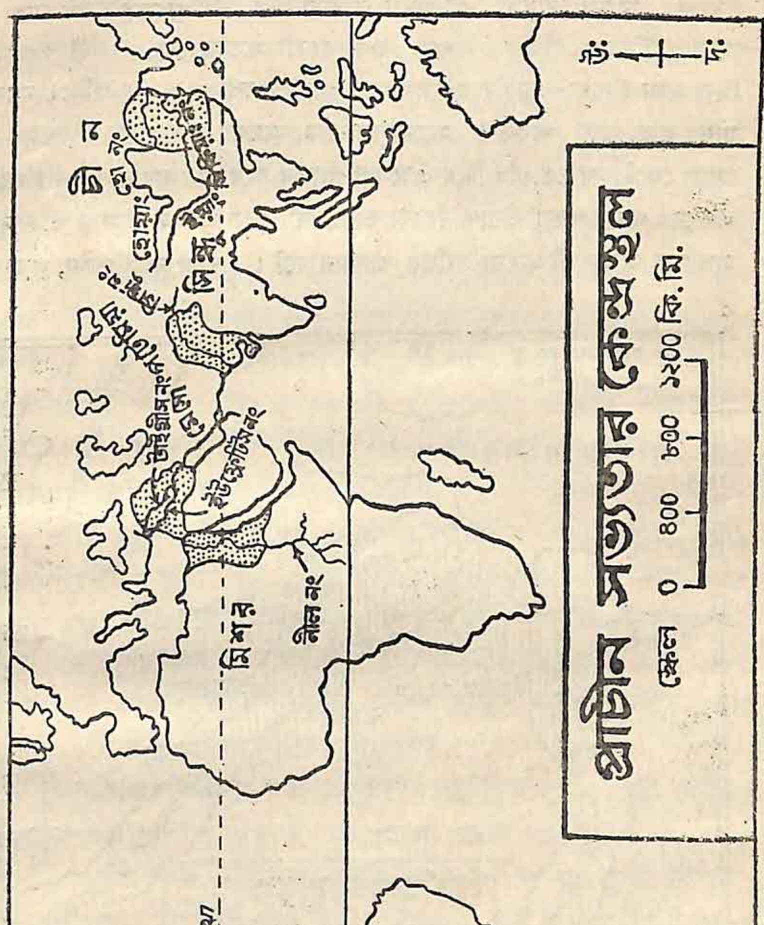
চতুর্থ অধ্যায় | মানব সভ্যতার আদিপর্ব

[৩০০০ খ্রীঃ পূঃ—১৫০০ খ্রীঃ পূঃ]

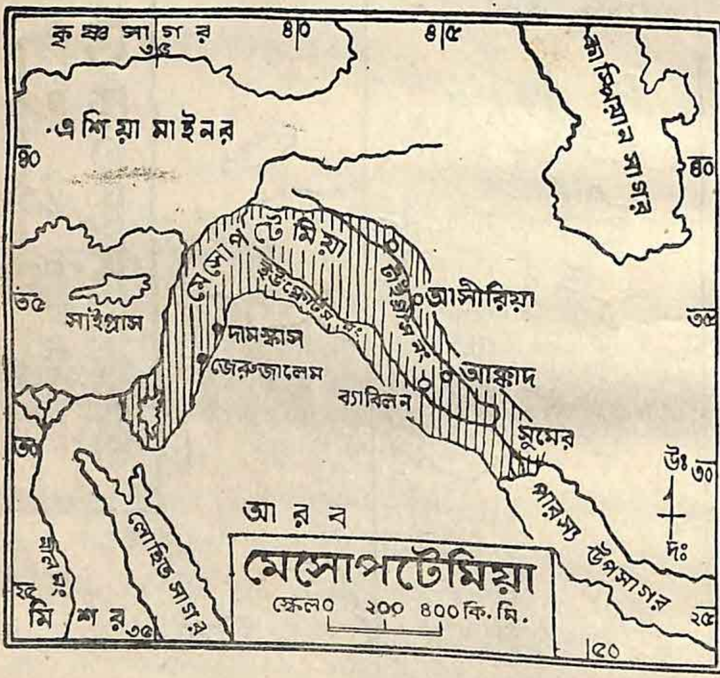
সূচনা। সভ্যতা বলতে বোঝায় উন্নত ও সমৃদ্ধ জীবনযাত্রা প্রণালী। চাষ-আবাদ করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যাযাবর ও লক্ষ্যহীন জীবনের অবসান ঘটল। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে এসে মানুষ কারিগরি ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করে। তারপর তারা চাষ-আবাদ ও কারিগরি বিদ্যা শিখল ; কথা বলতে, লিখতে ও পড়তে শিখল। গ্রাম ও নগর নির্মাণ করে বাস করতে লাগল। আদিম মানুষের বর্বর অসভ্য জীবনের অবসানে দেখা দিল এক নতুন সভ্য জীবন। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য সবার আগে প্রয়োজন খাদ্য ও বাসস্থান। সেজন্যই চাষ বাসের গুরুত্ব খুব বেশি। চাষের জন্য দরকার জলের। নদীতে আছে প্রচুর জল - আর সেই জলকে লাগান হল চাষের কাজে। এজন্য মানব সভ্যতার আদিপর্বে নদীর ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন মানব-সভ্যতার যেসব অঞ্চল বিকাশ ঘটেছিল সবগুলিই ছিল নদীর তীরে ; যেমন **ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিসের তীরে মেসোপটেমিয়া, নীল নদের তীরে মিশর, সিন্ধু নদের তীরে ভারত এবং হোয়াংহো-ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরে চীন।** প্রাচীন সভ্যতার এরূপ নদী-নির্ভরতার জন্য একে বলা হয় **নদীমাতৃক সভ্যতা।** বর্তমান অধ্যায়ে আমরা সেই আদিপর্বের মানব-সভ্যতা সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করব। এর আগে তিনটি যুগের যে ইতিহাস আমরা পড়েছি—মনে হবে, তার মধ্যে সময়ের ব্যবধান বুঝি খুব বেশী নয়। আসলে কিন্তু এই এক একটি যুগ মানে বেশ কয়েক হাজার বছর। সেকালে মানুষের উন্নতি হয়েছিল খুবই ধীরে ধীরে।

১। মেসোপটেমিয়া :

(ক) **অবস্থান ও প্রাচীনতা**—প্রাচীন নাম মেসোপটেমিয়া, আধুনিক নাম ইরাক। গ্রীকদের কাছে মেসোপটেমিয়া শব্দের অর্থ হল দুই নদীর মধ্যবর্তী দেশ। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ছিল মেসোপটেমিয়া। এখানে আজ থেকে প্রায় ছয় হাজার বছর আগে এক উন্নত


প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রস্থল
স্কেল 0 ৪00 ৮00 ১২00 কি.মি.
উঃ
দঃ
মিশর
নীলনং
ইউফ্রেটিসনং
কর্কটক্রান্তি রেখা
বিষুবরেখা

সভ্যতার বিকাশ ঘটে। এই সভ্যতার আর এক নাম সুমেরীয় সভ্যতা। মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণ অংশকে বলা হতো সুমের দেশ। এই অঞ্চলটি ছিল জলা জায়গা—চারদিকে নলখাগড়া আর বন-জঙ্গল। নীচু জমিতে বারো মাস জল জমে থাকত। সুমেরবাসীদের আগেই একদল লোক এখানকার জঙ্গল কেটে; নদীতে বাঁধ দিয়ে এবং চাষ-আবাদ করে বাস করতে থাকে। পরে এখানে খুব সম্ভব ইরাণ কিংবা ভারতবর্ষ থেকে একদল সুসভ্য ও উন্নত সভ্যতার অধিকারী মনুষ্য জাতির আগমন ঘটে। তারা নগর পত্তন, গৃহ ও



মন্দির নির্মাণ, শিল্প ও বাণিজ্যের মাধ্যমে এক সমৃদ্ধতর জীবনধারা গড়ে তোলে। এই সুমের অঞ্চলেই সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটে। সেজন্যই এই প্রাচীন সভ্যতাকে বলা হয় সুমেরীয় সভ্যতা।

পণ্ডিতদের মতে, এই মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা মিশর, চীন ও সিন্ধু সভ্যতার চেয়ে প্রাচীনতম ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে এখানে যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে সেটা থেকেই তাঁরা এরূপ অনুমান করেছেন। অবশ্য অন্যান্য সভ্যতার চেয়ে কতটা প্রাচীন সেটা ঠিকভাবে নিরূপণ করা

কঠিন। প্রাচীন ইতিহাসের কাল নিরূপণ প্রধানতঃ অনুমানের ওপর নির্ভরশীল। সেজন্যই নিখুঁত হিসেব-নিকেশ করে বলা যায় না মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা অন্যান্য সভ্যতার চেয়ে কত বেশি প্রাচীন। তবে মেসোপটেমিয়ায় প্রাপ্ত নিদর্শন মিশর বা সিন্ধু সভ্যতার যুগেও পাওয়া গেছে। সমুদ্রপথে এসব দেশের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যিক লেন-দেন চলত। সেটা থেকে আমরা বলতে পারি মিশর বা সিন্ধু সভ্যতার প্রায় সমকালীন না হলেও অল্প কিছুকাল আগে মেসোপটেমিয়ায় সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল।

(খ) **জমির উর্বরতা ও খাদ্যশস্য**—সুমেরিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল ছিল জলা জায়গা। প্রথমে এখানে গড়ে তোলা হয় এক উন্নত জলনিকাশী ব্যবস্থা। নদী ও বৃষ্টির জল নানাভাবে কাজে লাগিয়ে চাষের উন্নতি বিধান করা হয়। তাতে জমির উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি পায়। প্রচুর খাদ্যশস্যের ফলন হয়। উৎপন্ন শস্যের মধ্যে ধান, গম, যব উল্লেখযোগ্য। তাই অধিকাংশ লোকের জীবিকা ছিল চাষবাস করা।

(গ) **বন্যা প্রতিরোধের প্রচেষ্টা**—ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর দুকূলপ্লাবী বন্যায় চারিদিক ভেসে যেত। সুমেরিয়ানরা বাঁধ নির্মাণ করে বন্যার জল প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে। পরে বাঁধে সঞ্চিত জল ছোট ছোট খাল কেটে শস্যক্ষেত্রে সরবরাহ করা হতো। এতে একদিকে যেমন বন্যা প্রতিরোধ হতো—অন্যদিকে তেমনি বাঁধের সঞ্চিত জল কৃষিক্ষেত্রে নিয়ে যাবার ফলে প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপন্ন হতো।

(ঘ) **অন্যান্য বৃত্তি বা পেশা**—সুমেরিয়ানদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকার্য ও পশুপালন। গরু, ভেড়া, মোষ ছিল প্রধান গৃহপালিত পশু। তাঁত কাপড় বুনত। পুরোহিত ধর্মীয় বিধান দিতেন। রাজা রাজ্যরক্ষা ও দেশশাসন করতেন। সৈন্যেরা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকত। যুদ্ধের সময় তারা ঢাল, তলোয়ার, বর্শা জাতীয় অস্ত্রের ব্যবহার করত। কুমার মাটির বাসন-কোসন তৈরী করত। একদল লোক কারিগরি বিদ্যায় লিপ্ত থেকে সূক্ষ্ম কারিগরি কর্মে দক্ষতা অর্জন করত। স্থপতিরা গৃহ নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত থাকত। এমনিভাবে সুমেরিয়ানদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন পেশায় নিযুক্ত থেকে আপন আপন জীবিকা নির্বাহ করত।

(ঙ) **সুমেরিয়ানদের কৃতিত্ব**—সুমেরিয়ানদের কৃতিত্বের বিভিন্ন পরিচয় এখানকার প্রাপ্ত নিদর্শনগুলিতে পাওয়া যায়। তারা শিল্প

স্থাপত্য, কারিগরি দক্ষতা, যানবাহন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রগতি লাভ করেছিল।

শিল্পোন্নতি : সৌধ ও পোড়া ইঁটের মন্দির—উর নামক এক প্রাচীন নগরীতে খননকার্যের ফলে এখানকার বিচিত্র সৌধ ও মন্দিরের ভগ্নস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে পোড়া ইঁটের তৈরী বহু সৌধ ছিল। সেগুলির গঠনরীতি ছিল বিচিত্র পরিকল্পিত এবং সঙ্গতিপূর্ণ। উচ্চতার দিক থেকে তারতম্য ছিল—কোনটি খুবই উঁচু, কোনটি মাঝারি, আবার কোনটি সাধারণ উচ্চতা বিশিষ্ট। পোড়া ইঁটের তৈরী বিভিন্ন ধাঁচের বহু মন্দির ছিল। তার মধ্যে চন্দ্র দেবতা—ন্যান্নার ও পর্বতের দেবতা—জিগুরেটের মন্দির উল্লেখযোগ্য। জিগুরেটগুলি ছিল পর্বতাকৃতি এবং প্রায় কুড়ি মিটার উঁচু। সেগুলির দেখাশুনা করার প্রধান দায়িত্ব ছিল পুরোহিতের উপর। ধর্ম-কর্মের সঙ্গে পুরোহিতরা বিদ্যাশিক্ষা দানে নিযুক্ত থাকতেন।

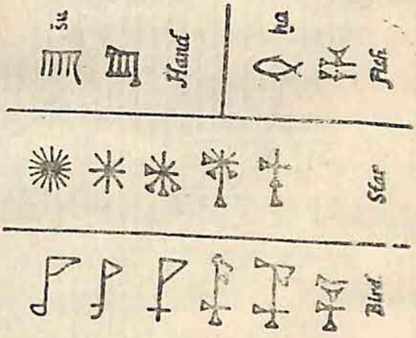
তৈলচিত্র বা ফ্রেস্কো—সুমেরিয়ানরা পোড়া মাটির ফলকে ও বিচিত্র মাটির পাত্রে সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকে রাখত। তারা এক প্রকার রঙ ব্যবহার করত। খুব সম্ভব তৈলচিত্র বা ফ্রেস্কোর তারাই পথদ্রষ্টা।

কারিগরি দক্ষতা—সুমেরিয়ানরা কারিগরি ক্ষেত্রে খুবই সুদক্ষ ছিল। এখানকার বাঁধ নির্মাণ, মন্দির, বস্ত্র নির্মাণ ও যুদ্ধে ব্যবহৃত ঢাল, তলোয়ার, বর্শা জাতীয় অস্ত্রশস্ত্র—এসব কিছুই সুমেরিয়ান কারিগরি-ক্ষেত্রে অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। খুব সম্ভব সুমেরিয়াতে পাথরের ব্যবহার অজানা ছিল। তারা অন্যদেশ থেকে পাথর আমদানি করে সেগুলি কেটে সুন্দর সুন্দর পাথরের বাসন তৈরী করত। ধাতব বিদ্যাতেও তারা পারদর্শী ছিল। ঢাল, তলোয়ার, বর্শা জাতীয় অস্ত্রশস্ত্র থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, তারা তামা বা ব্রোঞ্জ গালিয়ে নিজেদের মনের মত জিনিস তৈরী করত। কোন্ ধাতুর সঙ্গে অন্য জিনিস কতটুকু পরিমাণে মেশালে অস্ত্রশস্ত্র বা বাসন-কোসন নির্মাণ করা যায় সে সম্বন্ধে তাদের পরিষ্কার ধারণা ছিল। নচেৎ এসব জিনিস কিছুতেই তারা নির্মাণ করতে পারত না।

যানবাহন ও ব্যবসা-বাণিজ্য—সুমেরিয়ানরা খুব সম্ভব পণ্য পরিবহনের জন্য গরু, ভেড়া, মোষ জাতীয় জন্তুকে কাজে লাগাত। এছাড়া গরু বা মোষে টানা গাড়ি বা রথ ছিল স্থলপথে তাদের প্রধান যানবাহন।

জলপথে তারা কাঠের তৈরী নৌকা করে ভারত, মিশর প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেন-দেন চালাত। মিহি কাপড়, শস্য ও শিল্পপণ্য বিদেশে চালান দিত। বিনিময়ে তারা অন্য দেশ থেকে সংগ্রহ করে আনত সোনা, রূপা জাতীয় মূল্যবান ধাতু এবং পাথর। তাদের ব্যবসা চলত প্রধানতঃ বিনিময়ের মাধ্যমে। প্রথমে সেটা চলত সরাসরিভাবে, যেমন—চালের বদলে মাটির বাসন। পরবর্তীকালে সেটা চলত পরোক্ষ-ভাবে। কড়ি বা কোন ধাতুখণ্ডকে তারা বিনিময়ের মাধ্যমরূপে ব্যবহার করত।

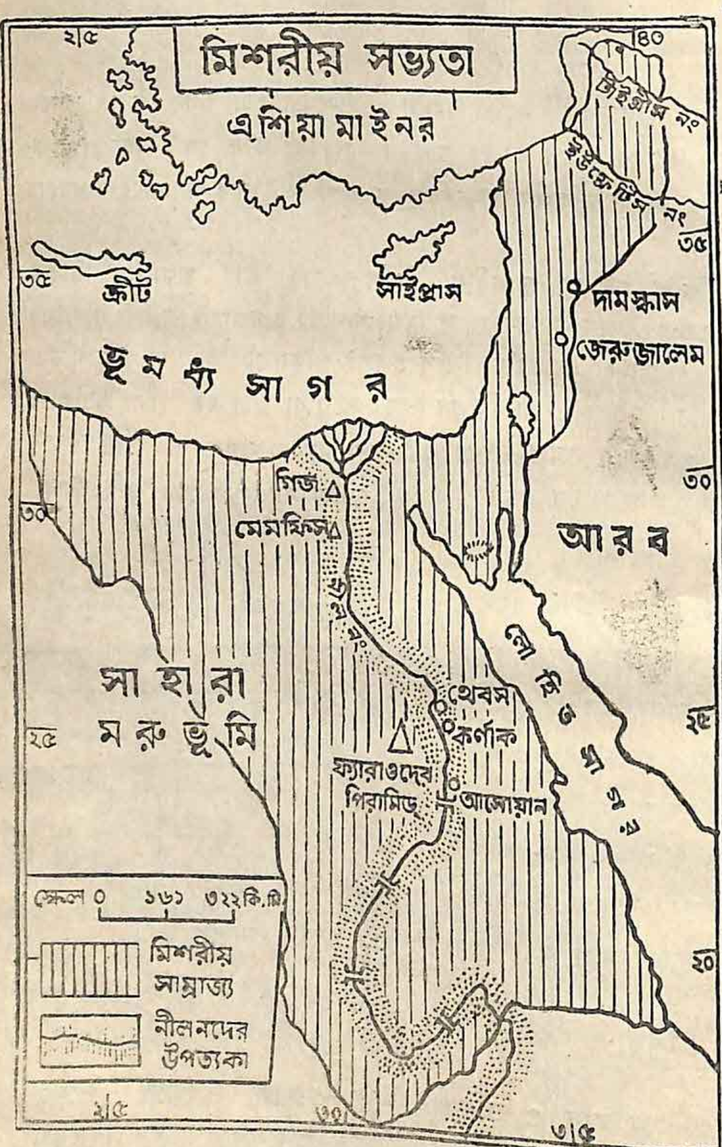
কিউনিফর্ম বা সুমেরীয় লিপি—মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম আবিষ্কারের জন্য ব্যাকুলতা পুরানো পাথরের যুগ থেকে আদিম মানুষের মনে দেখা দেয়। সুমেরীয় লিপিতে সেই ব্যাকুলতা বিচিত্রভাবে রূপায়িত হয়ে ওঠে। ছবি এঁকে বা বিভিন্ন চিহ্নের সাহায্যে তারা এক বিচিত্র চিত্রলিপি গড়ে তুলেছিল। তারা টালির মত কাদা মাটির ফলক বা বোর্ড তৈরী করে সেটা আগুনে পোড়াত। আর এই পোড়া মাটির ফলকের ওপর লিখত তাদের চিত্রলিপি। এরূপ পোড়ানো প্রায় তিরিশ হাজার টালি খননকার্যের ফলে সুসা নগরে পাওয়া গেছে। এসব নিদর্শন থেকে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, সুমেরিয়ান-দের মধ্যে ব্যাপক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা হতো। অসংখ্য চিত্রলিপি বা কিউনিফর্ম লিপির আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে সেটাই প্রমাণিত হয়।


কিউনিফর্ম বা সুমেরীয় লিপি

২। মিশর:

(ক) **অবস্থান ও ভূমির বৈশিষ্ট্য**—তোমরা ভূগোলে পড়েছ, পৃথিবীর সমগ্র স্থলভাগকে কয়েকটি প্রধান মহাদেশে ভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে আফ্রিকা অন্যতম। আফ্রিকা মহাদেশের একদিকে ঘন জঙ্গল—সেখানে বাঘ, সিংহ, গণ্ডারজাতীয় হিংস্র জন্তু-জানোয়ার, আর একদিকে

ধু ধু মরুভূমি —পৃথিবীর দীর্ঘতম মরুভূমি সাহারা। দীর্ঘকাল আফ্রিকা লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। সেজন্য আফ্রিকাকে বলা হয় অন্ধকারাচ্ছন্ন



মহাদেশ।

এই আফ্রিকা মহাদেশের একটি দেশ—মিশর, আর একটি নদ—

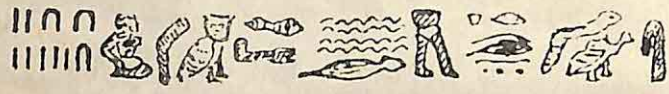
নীল। এই নীলনদের তীরে মিশর দেশ। আফ্রিকার মধ্যভাগ থেকে শুরু করে মিশর হয়ে নীলনদ ভূমধ্যসাগরে পড়েছে। এই মিশরে আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে এক উন্নত ও সমৃদ্ধ সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। নীলনদের পলিতে গড়া এই মিশর। নীলনদে মাঝে মাঝে বন্যা হতো—পলি পড়ত। তাই এর মাটি হয়েছে সরস, কোমল ও চাষবাসের উপযোগী। নীল নদের তীরে অবস্থিত বলেই মিশর ঘন জঙ্গলে কিংবা মরুভূমিতে পরিণত হয় নি। সেখানে গড়ে উঠেছে মনুষ্যবসতি আর এক উন্নত সভ্যতা। **একারণেই মিশরকে বলা হয় নীলনদের দান।**

(খ) ফ্যারাও -মিশরের রাজার উপাধি ছিল 'ফ্যারাও'। আমাদের দেশের রাজাদের যেমন উপাধি ছিল সম্রাট। প্রথমে একদল যাযাবর জাতি খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য ঘুরতে ঘুরতে একদিন মিশরে পেঁছায়। পরে সেখানে চাষবাসের উপযোগী জমি দেখে বসতি গড়ে তোলে। তাই উত্তর মিশরের উর্বর ভূমিতে অনেকগুলি খণ্ড-ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠেছিল। প্রত্যেক রাজ্যেই রাজা ছিলেন। তারপর উত্তর মিশরের ব-দ্বীপ অঞ্চলে এবং ব-দ্বীপের নিম্ন অঞ্চলে দুটি শক্তিশালী রাজ্যের উদ্ভব হয়। আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে প্রবল পরাক্রান্ত **মিনিস** নামে এক বীর গোটা মিশরের একচ্ছত্র অধিপতি হন। তাঁর সুগঠিত নেতৃত্বে এবং পরাক্রমের ফলে মিশরের অনেক উন্নতি ঘটে। মিনিসের রাজধানীর নাম ছিল **মেম্‌ফিস**। তাঁর পরে অনেক রাজা ও রাজ-বংশের ভাঙাগড়া চলে। ফ্যারাওদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু একসময়ে দুর্বল ও অপদার্থ ফ্যারাওদের অতিরিক্ত বিলাস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর দেওয়াতে ফ্যারাওরা ধীরে ধীরে শক্তিহীন হন। মিশরে বাইরের শত্রুর আগমন ঘটে আর মেমফিস নগরীর গৌরব ম্লান হয়ে যায়।

পুরোহিত—মিশরে রাজার পরেই ছিল পুরোহিতের স্থান। তিনি মন্দিরে থেকে পূজা ও দেবার্চনা করতেন। বিদ্যাশিক্ষা দানের দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর। অন্য সময়ে রাজাকে বুদ্ধি ও পরামর্শ দিতেন। অবসর সময়ে পুরোহিত জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় নিযুক্ত থাকতেন। তিথি-নক্ষত্রের বিধান দিতেন। এভাবে একদিকে ধর্মকর্ম এবং অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা— এই দুইভাবে পুরোহিতের জীবন কাটত।

মিশরের লিপি ও খোদাই করা বর্ণমালা—প্রাচীন সুমেরীয়রা ছবি এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করত। যেমন—নদীর ধারে হরিণ শিকারের

অভিজ্ঞতা বর্ণনার জন্য এঁকে দিল নদীর তীর আর হরিণ। কিন্তু এভাবে কত ছবি আঁকবে? তাই মিশরীয়রা সেখানে সংকেত চিহ্নের ব্যবহার করতে লাগল। সংকেত-চিহ্নগুলিও ছিল এক-একটি ছবি। ছবি দিয়েই হতো অক্ষর আর



মিশরীয় লিপি

অক্ষরের সমষ্টি **বর্ণমালা**। প্রত্যেকটি ছবির উচ্চারণ-পদ্ধতি ছিল ভিন্ন ভিন্ন। মিশরীয়দের উদ্ভাবিত এ জাতীয় বর্ণমালাকে বলে **হিয়ারোগ্লিফিক** বা **মিশরীয় লিপিমালা**। তারা লিখত নলখাগড়া হতে তৈরী এক ধরনের কাগজে—কাগজের নাম **প্যাপিরাস**। সম্ভবতঃ এই প্যাপিরাস শব্দ থেকেই ইংরেজি পেপার শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। প্যাপিরাস ছাড়া মন্দির ও প্রাসাদের গায়েও মিশরীয়রা খোদাই করে লিখত। পণ্ডিতেরা হিয়ারোগ্লিফিক লিপির পাঠোদ্ধার করেন গ্রীক ভাষার প্রতিলিপির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে। এই দুঃসাধ্য প্রচেষ্টাকে সার্থক করার জন্য ফরাসী মণীষী শাঁপোলিওর নাম স্মরণীয় হয়ে আছে।

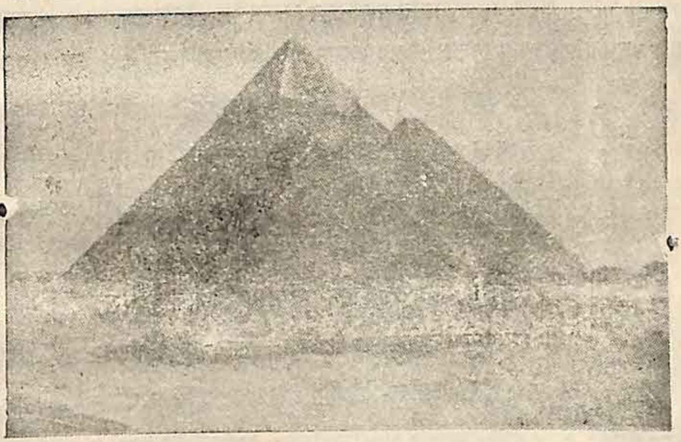
রাজস্ব সংগ্রাহক ও সৈনিক—ফ্যারাওরা দেশের শাসনকার্য চালাবার জন্য রাজস্ব সংগ্রহ করতেন। রাজস্ব সংগ্রহ করার জন্য একদল রাজকর্মচারী নিযুক্ত ছিল। এদের বলা হতো রাজস্ব সংগ্রাহক।

পূর্বে মিশরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে প্রত্যেক স্বাধীন রাজার অধীনে ছিল সুগঠিত সৈন্যদল। পরে যখন মিনিসের সময়ে গোটা মিশর একজন মাত্র ফ্যারাওয়ের অধীনে আসে তখন রাজার সৈন্য ফ্যারাওয়ের সৈন্যে পরিণত হয়। খুব সম্ভব ক্রীতদাসদের নিয়ে এই সৈন্যদল গড়ে উঠেছিল। এরা বাইরের শত্রুর আক্রমণের মোকাবিলার জন্য যুদ্ধে যেত। আবার যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ চলত না তখন রাস্তাঘাট তৈরী, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি কার্যে এদের নিযুক্ত রাখা হতো।

(গ) ব্যবসা-বাণিজ্য—মিশরবাসী ব্যাবসা-বাণিজ্যে খুবই উন্নত ছিল। ব্যবসা চলত প্রধানতঃ বিনিময় প্রথায়। প্রথমে প্রত্যক্ষ বিনিময় হলেও পরে পরোক্ষ বিনিময় প্রথা চালু হয়। ব্যবসার প্রয়োজনে সুমেরিয়ানদের মত মিশরীয়রা গরু, মোষ, উট, গাধা জাতীয় জন্তুকে কাজে লাগাত।

গরু, মোষ, ঘোড়া জাতীয় জন্তুর দ্বারা চালিত চাকার টানা গাড়ির ব্যবহার সেখানে প্রচলিত ছিল। জলপথে বাণিজ্য চলত কাঠের তৈরী নৌকার সাহায্যে। এখান থেকে ভারত ও মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে জলপথে বাণিজ্য চলত। এদেশ থেকে তারা খাদ্যদ্রশস্য মিহি বস্ত্র ও কাচের বাসন অন্যদেশে রপ্তানি করত। ঐসব পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে তারা অন্যদেশ থেকে আনত সোনা, রূপাজাতীয় মূল্যবান ধাতু, হাতির দাঁত ও পাথরের তৈরী বাসন-কোসন।

(ঘ) **পিরামিড**—মিসরবাসী মনে করত দেহের মৃত্যু হলেও—আত্মার মৃত্যু নেই। মৃত্যুর পরেও **ওসিরিস** নামে দেবতার রাজ্যে অনন্ত সুখ ও সমৃদ্ধিময় এক নতুন জীবন অপেক্ষা করছে। তাই মিশরে ফ্যারাও এবং অভিজাত ব্যক্তিদের মৃত্যুর পরে তাদের মৃতদেহ মূল্যবান বস্ত্র দ্বারা ঢেকে একপ্রকার রাসায়নিক তেল ব্যবহার করা হতো। এতে মূল্যবান কাপড়ে



পিরামিড

ঢাকা মৃতদেহ সহজে পচতে পারত না। একে বলা হয় মমি। মাটি খুঁড়ে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বহু মমির সন্ধান পেয়েছেন। সেগুলির মধ্যে টুটেন খামেন নামে ফ্যারাওয়ের মমি তাঁর সমাধি থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। তাতে পাওয়া গেছে সোনা ও পাথরের অলংকার, খাবার জল, বাসনপত্র এবং আরও কত কি। এই সব মমির ওপরে তিন কোণা সমাধি মন্দির নির্মাণ করা হতো। সেগুলিকে বলে পিরামিড।

বহু লোক দীর্ঘকাল ধরে কঠোর পরিশ্রম করে এই সব পিরামিড নির্মাণ করে। এগুলির নির্মাণে অসামান্য কারিগরি দক্ষতা ও নিখুঁত মাপজোখ

এ যুগের ইঞ্জিনিয়ারদের মনেও সবিস্ময় কৌতূহলের উদ্রেক করে। গিজে শহরে বহু পিরামিড আবিষ্কৃত হয়েছে। ভাবলে সত্যই অবাক লাগে; অসংখ্য লোকের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐশ্বর্যের বিনিময়ে এই সব পিরামিডগুলি নির্মিত হতো। প্রতিটি পিরামিডের সাথে মিশে আছে নির্যাতন; শোষণ; স্বেচ্ছাচার ও বিলাসিতার এক বেদনাদায়ক ইতিহাস। তথাপি আজও পিরামিড পৃথিবীর **সপ্তম আশ্চর্য্যের** অন্যতম আশ্চর্যরূপে পরিগণিত। জানি না ফ্যারাওদের আত্মা সত্যসত্যই ওসিরিস্ নামে দেবতার রাজ্যে নতুন জীবন শুরু করেছে কিনা—তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, পিরামিড-গুলি প্রাচীন মিশরের শিল্পী—কারিগরদের কর্মদক্ষতার জীবন্ত সাক্ষী হয়ে আজও বিদ্যমান।

(৬) **ধর্মীয় বিশ্বাস**—মিশরীয়রা প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশকে দেব-দেবীজ্ঞানে পূজা করত। তাদের দেব-দেবীর সংখ্যা ছিল প্রচুর। প্রত্যেক অঞ্চলের পৃথক পৃথক দেবতা ছিল। এক এক অঞ্চলে ছিল এক এক দেবতার প্রাধান্য। যেমন—রা ও **আমন** ছিলেন সূর্যের দেবতা। পাতাল ও মৃত্যুর দেবতা ছিলেন **ওসিরিস**। টা ছিলেন কারুশিল্পের দেবতা। ব-দ্বীপ অঞ্চলে রা, এবিডস নগরে ওসিরিস এবং মেম্‌ফিসে টা-এর মন্দির ছিল। পরবর্তীকালে সমগ্র মিশরে এইসব দেব-দেবীর প্রাধান্য স্বীকৃতি পায়। দেব-দেবীরা ছিলেন বিচিত্র দর্শন ও জন্তু-জানোয়ারের আকৃতি বিশিষ্ট। কোন কোন দেবতার মাথাটা ছিল ভেড়া, বিড়াল বা কুমীরের মত। পুরোহিত ছিলেন বিশেষ মর্যাদাবান ব্যক্তি। কারণ বদরাগী দেবতাদের খুশি করার ছলাকলা বোধ হয় পুরোহিতদের নখদর্পণে। এরই সুযোগ নিয়ে তারা নিজেদের খেয়াল খুশিমত দৈবাদেশের ব্যাখ্যা দিতেন। কখনও বা জন্তু-জানোয়ার বলি দিয়ে দেবতাকে খুশি করার বিধান দিতেন। নরবলির বিধান দিতেও তাঁরা কোনরূপ দ্বিধাবোধ করতেন না। এইভাবে আজগুবি ব্যাখ্যা, ভণ্ডামি ও শোষণের আদব-কায়দাকে পুরোহিত সম্প্রদায় নিজেদের



মিশরের দেবতা

স্বার্থে ধর্ম বলে চালাতেন।) সাধারণ মানুষ অন্ধ বিশ্বাসে সেটাকেই চরম বলে মেনে নিতেন।

(চ) **প্রধান প্রধান জীবিকা**—কৃষি ও পশুপালনই ছিল মিশরের লোকদের প্রধান জীবিকা। রাজা দেশশাসন করতেন। পুরোহিত ধর্ম-কর্ম ও জ্ঞান-চর্চায় নিযুক্ত থাকতেন। শিল্পীরা সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকতেন। মিশরে কারিগরি বিদ্যার খুবই উন্নতি ঘটে। দক্ষ কারিগরেরা নীল নদের ওপর বাঁধ নির্মাণ করে বন্যা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে। এই বাঁধ নির্মাণে মিশরীয়দের অসামান্য কারিগরি দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যদিকে পিরামিডগুলির নির্মাণে সূক্ষ্ম মাপজোখ এবং বৈজ্ঞানিক ভারসাম্য বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। মিহি কাপড়, রঙিন কাচ এবং সুদৃশ্য চামড়ার জিনিসপত্র নির্মাণেও তাদের কারিগরি দক্ষতার স্বাক্ষর মূর্ত হয়ে উঠেছিল। আর ছিল ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। তাঁরা স্বদেশে ও বিদেশে ব্যবসা চালাতেন।

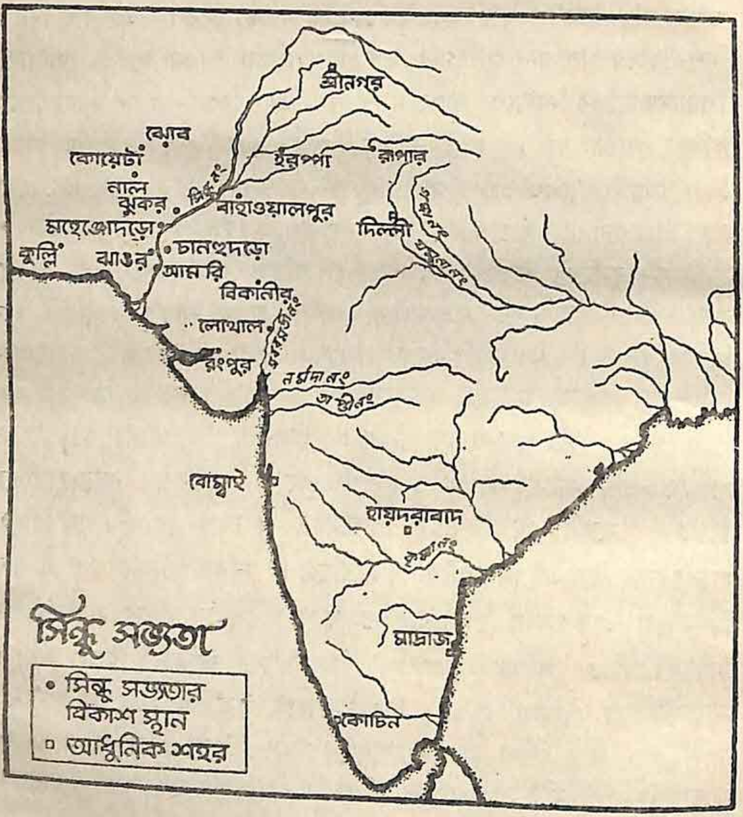
(ছ) **কৃতিত্ব** - ভেবে দেখ, আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগের কথা—তখন পিরামিডের মত অপূর্ব সুন্দর সৌধ নির্মাণ আমাদের মনে বিস্ময় জাগায়। হিয়ারোগ্লিফিক লিপির উদ্ভাবন প্রাচীন মিশরবাসীর কৃতিত্বের পরিচয় মেলে। মানুষের মনের ভাব প্রকাশের বাহন ভাষা। ভাষা গড়ে ওঠে শব্দ ও বর্ণ নিয়ে। মিশরীয় লিপিমালা সে যুগের মানুষের অসামান্য সৃজনী ক্ষমতার পরিচায়ক। খুব সম্ভব রসায়ন বিদ্যা চর্চারও পথদ্রষ্টা এই মিশর। পরিমিতি বিদ্যা ও তিথি-নক্ষত্র গণনার সূচনা বোধ হয় এই মিশরেই প্রথম হয়েছিল। মমির পচন নিবারণের জন্য মিশরীয়রা এক প্রকার তেল ব্যবহার করত। রঙিন কাঁচের সুদৃশ্য পাত্র নির্মাণ করতে পারত। এগুলি মিশরীয়দের রসায়ন বিদ্যা চর্চা ও অনুশীলনের পরিচয় দেয়। মিশরবাসীরাই সর্বপ্রথম তিন শত পঁয়ষট্টি দিনে এক বছর গণনা করে ক্যালেণ্ডার বা দিনপঞ্জী রচনা করেছিল। সর্বোপরি, পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য পিরামিডের নির্মাতা রূপে প্রাচীন মিশর-বাসী আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

৩। সিন্ধু সভ্যতা :

ইউফ্রেটিস—টাইগ্রিস উপত্যকায় যেমন সুমের দেশে, নীল নদের তীরে মিশরে—ঠিক তেমনি সিন্ধু নদের উপত্যকায় ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালে এক উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। প্রাচীনতার দিক থেকে সিন্ধু-নদের অববাহিকায় গড়ে-ওঠা সভ্যতা ঐ দুটি সভ্যতার প্রায় সমকালীন। প্রত্নতাত্ত্বিক

খননকার্যের ফলে সিন্ধুসভ্যতার যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলি থেকে পণ্ডিতদের ধারণা ঐ সভ্যতা প্রায় পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন।

(ক) **কেমন করে সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হল**— আঠারো শ' ছাপান্ন সাল। তখন ইংরেজরা এদেশ শাসন করছে। তারা ঠিক করল, এদেশে পরিবহনের উন্নতির জন্য রেলপথ গড়ে তুলবে, তারই

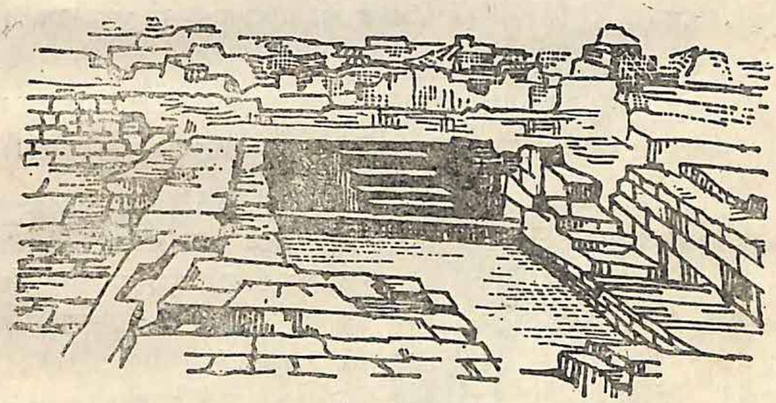


উদ্যোগ চলছিল। করাচী থেকে লাহোর পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা অনুযায়ী মাটি কাটা শুরু হয়। হঠাৎ সেখানে পাওয়া যায় কতকগুলি ইঁট। সেগুলি বেশ মজবুত। মাটির তলায় খুঁড়ে স্তরে স্তরে সাজান আরও বহু ইঁট, ইঁটের তৈরী গৃহ এবং সুপরিকল্পিত নগরীর ভগ্নস্তূপের সন্ধান পাওয়া গেল। শীঘ্রই এই অঞ্চলটি প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের নজরে আসে। অল্পদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম

অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত অঞ্চলে ব্যাপক খননকার্য চলে। তাতে প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার আরও বহু লুপ্ত নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়।

১৯২২ সালে বাঙালী ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও জন মার্শালের চেষ্টায় মহেঞ্জোদড়োর খননকার্য চলে। আবার ঠিক ঐ একই সময়ে রায়বাহাদুর দয়ারাম সাহানী হরপ্পায় খননকার্য শুরু করেন। এভাবে ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার বহু লুপ্ত নিদর্শন আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা এই দুটি অঞ্চলই বর্তমানে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রে পড়েছে। সিন্ধুদেশের মণ্টেগোমারীতে মহেঞ্জোদড়ো এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের লারকানা জেলায় হরপ্পা অবস্থিত। হরপ্পায় পাওয়া বহু শীলমোহরের আজও পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নি। সিন্ধু ভাষায় মহেঞ্জোদড়ো শব্দের অর্থ মৃতের স্তূপ। সত্যই এই মৃতের স্তূপ বহুদিন ধরে মৃতের কীর্তি বুকে ধরে রেখেছিল।

(খ) **নগর পরিকল্পনা**—প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা সুপরিকল্পিত নগরে বাস করত। এখানে মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে বড় বড় শহরের ভগ্নাবশেষ। এখানকার রাস্তাঘাট ছিল বেশ চওড়া।



মহেঞ্জোদড়োয় প্রাপ্ত স্নানাগার

রাস্তার দুই দিকে পোড়া ইঁটের তৈরী উঁচু উঁচু বাড়ি—কোনটি দোতলা, কোনটি বা তিনতলা। ঘরে আলো-বাতাস চলাচলের সুবিধার জন্য জানালা-দরজা ছিল। ওপরে ওঠার জন্য ছিল সিঁড়ি। শহরে বড় বড় রাস্তা, গলি, ময়দান, নর্দমা, দোকানপাট, স্নানের চৌবাচ্চা ইত্যাদি বহু নিদর্শন এখানে পাওয়া গেছে।

নর্দমার সাহায্যে দূষিত নোংরা জল শহরের বাইরে বের করে দেওয়ার সুবন্দোবস্ত ছিল। হরপ্পায় খাদ্যশস্য মজুত রাখার জন্য একটি বড় গোলা ছিল। পানীয় জলের জন্য ছিল পাতকুয়া। এসব থেকে অনায়াসে অনুমান করা যায় যে, সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা শহর-নির্মাণ ও পৌর-শাসনে বেশ পটু ছিল। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে এরূপ সুপরিকল্পিত নগরী নির্মাণ নিঃসন্দেহে তাদের উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় দেয়।

(গ) **খাদ্য ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদি**—সিন্ধু নদের তীরের বাসিন্দাদের প্রধান খাদ্যশস্য ছিল গম ও যব। আর খেত মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ও খেজুর। নাগরিক জীবনের সবচেয়ে বেশি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসবহুল জীবন তারা ভোগ করত। এখানে পাওয়া বিভিন্ন নিদর্শন দেখে মনে হয়, এখানকার অধিবাসীরা পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। পুরুষেরা পরত সুতির কাপড় ও গায়ে দিত চাদর। মেয়েরা ঘাগ্‌রা পরত ও কোমরে মেখলা বাঁধত। তাদের মধ্যে আংটি, চিরুণি, বালা, হার, নাকছাবি, মাথার কাঁটা ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের অলংকারের প্রচলন ছিল। তারা হাতির দাঁত, পাথর আর শাঁখের তৈরী নানা প্রকার জিনিষ ব্যবহার করত। মেয়েরা মাথায় লম্বা চুল রাখত। চিরুণি দিয়ে চুল আঁচড়াত আর সাজগোজ করার জন্য প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার করত।

(ঘ) **শিল্প ও কারিগরি দক্ষতা**—সিন্ধু নদের তীরের অধিবাসীরা শিল্পকর্মে ও কারিগরি ক্ষেত্রে ছিল খুবই নিপুণ। সুন্দর সুন্দর অলংকার নির্মাণ, হাতিরদাঁত ও পাথরের তৈরী দ্রব্যাদিতে তাদের শিল্প-চাতুর্যের পরিচয় মেলে। এখানে বহু শীলমোহর পাওয়া গেছে। সুদৃশ্য সীসা বা ধাতুখণ্ডকে বলা হয় শীলমোহর। ঐসব শীলমোহরগুলি ছিল দেখতে খুব সুন্দর ও মনোরম। এগুলিতে নানা রকমের ছবি আঁকা থাকত। কুমারেরা চাকা ঘুরিয়ে নানা মাটির পাত্র গড়ত। তারপর সেগুলি পুড়িয়ে শক্ত করত। পাত্রের ওপর রকমারি নক্‌শা আঁকত আর চকচকে পালিশ দিত। কুটিরশিল্পেও মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা খুব উন্নত



শীলমোহর

ছিল। কুমার যেমন সুদৃশ্য ও নানা রকমের মাটির পাত্র তৈরী করত, তাঁতিও তেমনি টেকো ও তক্‌লিতে মিহি সুতো কেটে কাপড় বুনত। সর্বত্রই ভারতের সূক্ষ্ম কাপড়ের কদর ছিল।

(ঙ) ব্যবসা-বাণিজ্য—মিশর এবং সুমেরিয়দের সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা জলপথে ব্যাবসা-বাণিজ্য চালাত। তিব্বতের সঙ্গেও তাদের ব্যাবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ ছিল। কাঠের তৈরী নৌকা ছিল প্রধান জলযান। গরু, ঘোড়া জাতীয় জন্তুতে টানা চাকার গাড়ির ব্যবহারও তাদের জানা ছিল। সমাজে ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠা ছিল। ব্যবসা চলত বিনিময়ের মাধ্যমে। প্রথমে প্রত্যক্ষ বিনিময় প্রথা ছিল। পরে খুব সম্ভব ধাতব খণ্ডকে বিনিময়ের মাধ্যমরূপে গণ্য করা হয়। দেশের বাজারে কেনাবেচার জন্য ওজনের বাটখারা ও মাপের গজকাঠি ছিল। ব্যবসায়ীরা খুব সম্ভব নিজেদের মালপত্র মোড়ক করে শীলমোহর লাগিয়ে দিত। খাদ্যশস্য ও কুটিরশিল্প তারা দেশ-দেশান্তরে পাঠাত। পশ্চিম দিকে স্থলপথে গরুতে বা মোষে টানা চাকার গাড়িতে করে পণ্য পাঠান হতো। খুব সম্ভব দক্ষিণে দ্রাবিড়দের দেশ থেকে তারা আনত সোনা, মিশর থেকে রঙিন সুদৃশ্য কাচের জিনিস এবং সুমেরিয়দের কাছ থেকে অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী। বিদেশের বাজারে তখন সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের নির্মিত পণ্যাদির খুবই কদর ছিল। স্বদেশের বাজারে চাষী, কামার, কুমার, ছুতার, স্বর্ণকার প্রত্যেকেই নিজ নিজ উৎপাদিত পণ্যাদি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করত। ব্যবসায়ীদের ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যস্থতাকারীরূপে সমাজে বেশ কদর ছিল।

(চ) ধর্মীয় জীবন—সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশের অন্তরালে এক-একজন দেব-দেবীর অস্তিত্ব কল্পনা করে বন্দনা করত। তাদের ধর্ম কি ছিল ঠিক বলা যায় না। এখানে বহু দেব-দেবীর শীলমোহর পাওয়া গেছে। গাছ বা প্রস্তরখণ্ডকে বন্দনা করার রীতি তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মাতৃকাদেবীর বন্দনা ও শৈব ধর্মের বিকাশ খুব সম্ভব সিন্ধু সভ্যতার যুগেই প্রথম দেখা যায়। এখানে পাওয়া শীলমোহরগুলির মধ্যে একটি দেবমূর্তি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, সেটি পশুপতি শিবের মূর্তি। তিনটি শিং-বিশিষ্ট একজন বিচিত্র দেবতা যোগাসনে বসে আছেন। তাকে ঘিরে আছে বাঘ, সিংহ, গণ্ডার জাতীয় বহু হিংস্র জন্তু। বোধ হয়, শিল্পী দেখাতে চেয়েছেন যে, যোগীর কাছে বনের পশুও হিংসা ভুলে কেমন সুন্দরভাবে বশ্যতা

স্বীকার করেছে। এছাড়া জীবজন্তুর পূজাও সেকালে প্রচলিত ছিল। মিশর বা সুমেরিয়ানদের মত সিন্ধু উপত্যকায় পুরোহিতের প্রভাব-প্রতিপত্তি তত বেশি ছিল না। দেব-দেবীর মন্দিরের নিদর্শনও সেখানে পাওয়া যায় নি।



পশুপতি শিবের মূর্তি

(ছ) সামাজিক জীবনধারার বৈশিষ্ট্য—সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা খুব সম্ভব প্রথম যুগে কোন রাজার অধীনে ছিল না। সেখানে ছোট-খাট অনেকগুলি স্বাধীন রাজ্য ছিল। মিশরের ফ্যারাও কিংবা সুমেরিয়ার রাজাদের মত এখানে কোন স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তা ছিল না। নাগরিকেরা নিজেদের মধ্যে বোধ হয় আলাপ-আলোচনা করে দেশশাসন করত। পরবর্তীকালে প্রধান নাগরিকের অধীনতা স্বেচ্ছায় এরা মেনে নেয়। এভাবে সেখানে রাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

তবে সেখানে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বজায় ছিল। বড়লোকেরা দ্বিতল, ত্রিতল গৃহে বাস করত। রকমারি অলংকারে সাজত। সরু ও মিহি কাপড় পরত। তাদের খাদ্য মজুত রাখার জন্য ছিল বিরাট বিরাট শস্যাগার। নাগরিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসবহুল জীবনযাপন করত ধনী লোকেরা। দরিদ্রেরা কঠোর পরিশ্রম করেও খুব সম্ভব ভাল করে খেতে পেত না।

কৃষি ও পশুপালনই ছিল প্রধান জীবিকা। সমাজে কুমার, কামার, তাঁতি, স্বর্ণকার, কারিগর—প্রত্যেকের বিশেষ মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা ছিল। মিশরের মত ধর্মের নামে ভণ্ডামি ও স্বেচ্ছাচার সেখানে চলত না। প্রত্যেকে নিজ নিজ পেশায় নিযুক্ত থেকে সবরকম ভাবে সমাজের সকলের জন্য সুখ ও স্বচ্ছন্দ বিধানের চেষ্টা করত।

সিন্ধুলিপি বা ব্রাহ্মীলিপি—সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির মধ্যে এক প্রকার সচিত্র লিপি পাওয়া গেছে। সেগুলি সুমেরিয়দের কিউনিফর্ম বা মিশরের হিয়ারোগ্লিফিক লিপির মত সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করা যায় নি। এই লিপিমালার পাঠোদ্ধার সম্ভব হলে এই সভ্যতা সম্পর্কে আরও বহু অজানা রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে।

কবে কেমন করে কোন্ জাতি সিন্ধু সভ্যতা গড়ে তুলেছিল আর কিভাবেই বা এই সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল তার সঠিক হিসেব আজও করা হয়ে ওঠে নি। যতটুকু হিসেব-নিকেশ করা হয়েছে তা প্রধানতঃ অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই। একদল পণ্ডিতের অনুমান, সিন্ধু সভ্যতা গড়ে তুলেছিল দ্রাবিড় জাতি। কারণ দ্রাবিড়দের মত জন্তুর মধ্যে ঘোড়া ও ধাতুর মধ্যে লোহার ব্যবহার তাদের অজানা ছিল। আর দ্রাবিড়দের মতই পাথর, গাছ, শিব ও মাতৃকা পূজার ব্যবস্থা তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

পণ্ডিতদের অনুমান—দুর্ভিক্ষ, মহামারি, বন্যা বা বাইরের শত্রুর ক্রমাগত আক্রমণে সিন্ধু সভ্যতার বিনাশ ঘটে। সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা যে জাতিই হোক না কেন, আর যে ভাবেই এই সভ্যতার পতন ঘটুক না কেন—এই সভ্যতার কথা ভাবলে আমাদের মনে সত্যিই খুব গর্ব বোধ হয়। কারণ আমরা ভারতবাসী (এখানে অবিভক্ত ভারতবর্ষের কথা বলা হয়েছে) এবং আমাদের দেশে আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে সিন্ধু সভ্যতার মত এক উন্নত নাগরিক সভ্যতার পত্তন হয়েছিল।

৪। চৈনিক সভ্যতা :

পৃথিবীর আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রাচীন সভ্যতা হল—চৈনিক সভ্যতা।

(ক) হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং উপত্যকা—প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর মধ্যবর্তী সমতল উপত্যকায় খনন কার্যের ফলে এই প্রাচীন সভ্যতার ভগ্নস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার মত এখানে পাওয়া নিদর্শনগুলি থেকে এই সভ্যতা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়।

হোয়াংহো নদীতে প্রতি বছর ভয়াবহ বন্যা হতো। আর তাতে চারদিক ভেসে যেত। ঘরবাড়ি ধ্বসে ভেঙে অনেকে গৃহহারা হতো। কৃষির ক্ষতি হতো এবং গবাদি পশু প্রাণ হারাত। এইভাবে হোয়াংহো আর ইয়াংসিকিয়াং নদী প্রাচীন চীনাদের চরম দুঃখ-দুর্দশার কারণ ছিল।

এই কারণেই হোয়াংহোকে বলা হয় চীনের দুঃখ। চীনারা এই ভয়াবহ বন্যা প্রতিরোধের জন্য বাঁধ নির্মাণ করেছিল। বাঁধ হতে পরে ঐ বন্যার জল খাল কেটে কৃষিক্ষেত্রে নিয়ে যেত। এর ফলে জমির উর্বরতা শক্তি বাড়ত। প্রচুর ফসল ফলত। কখনও বা নদীর পলিতে জমি চাষ-বাসের পক্ষে উপযোগী হয়ে উঠত। সাধারণতঃ পোড়া মাটির তৈরী ইঁট দিয়ে এই সব বাঁধ দেওয়া হতো। সেগুলি ভেঙে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকত না। তবুও চীনা কারিগরেরা প্রতি বছর এই সব বাঁধের সংস্কার করত।

(খ) **প্রাচীন চীনাদের জীবনধারা**—চীনের হোনান ও মাঞ্চুরিয়া প্রদেশের মাটি খুঁড়ে প্রাচীন চৈনিক সভ্যতা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেছে। পণ্ডিতদের অনুমান, এই সভ্যতা প্রায় পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন। চীনের গুহামানবদের কথা তোমরা আগেই পড়েছ। পাথরের যুগের পূর্বেই প্রাচীন চীনে আদিম মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল। হোয়াংহো এবং ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরে কৃষিকার্য ছিল খুবই উন্নত। তাই এখানকার অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি। এই সভ্যতার আরও যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলি বড়ই বিচিত্র। যেমন—কচ্ছপের পিঠে, হরিণের শিংয়ের ওপরে এবং ভেড়ার গলার হাড়ের ওপরে আঁকা নানা প্রকার চিত্রলিপি। তাছাড়া কাঠ ও হাড়ের ওপরে প্রাচীন চীনের চিত্রলিপি খোদাই করা আছে। তীর-ধনুক ও বর্শাসহ নানা রকম জন্তু শিকারের দৃশ্য এবং মাটির পাত্রে আঁকা বিভিন্ন রকমের ছবিও দেখতে পাওয়া গেছে। এখানে মাটির তলায় পাওয়া গেছে অনেক রকমের পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ; যেমন—ছুরি ও কুঠার, শ্লেট পাথর ও হাড় ঘষে তৈরী করা তীরের ফলা। চীনারা সুতো কাটত, মাটির পাত্র তৈরী করত, শূকর পুষত এবং গ্রামে বাস করত। এরা ছিল মঙ্গোলীয় জাতি গোষ্ঠীর অন্তর্গত।

চীনে প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপন করেন শাং বা ইন্ বংশীয় সম্রাটেরা। হোনান্ অঞ্চলে ইন্ বংশের স্তূপ নামক স্থানে ছিল শাং বংশের সম্রাটদের রাজধানী। এই বংশের সতেরো জন রাজা প্রায় সাড়ে ছয় শ বছর রাজত্ব করেন। শাং বংশের সম্রাটদের ক্ষমতা, মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা ছিল খুব বেশি। সেজন্য তাদের বলা হতো দেবতার পুত্র। চীনে নানা দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। একমাত্র সম্রাটই ছিলেন পূজা ও যজ্ঞ করবার অধিকারী। এখানে মৃত পূর্বপুরুষ ও প্রকৃতির পূজার বিধান ছিল।

(গ) চীনের পৌরাণিক কাহিনী—প্রাচীন চীনে বহু মজার মজার পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত ছিল। এখানে পানকু নামে সর্ব-শক্তিমান এক রাজা আঠার হাজার বছর রাজত্ব করেন। তিনি এক সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেন। সেখানে নদ-নদী, গাছপালা প্রভৃতি জন্মায়। এমনি পাঁচজন সর্বশক্তিমান রাজার কাছ থেকেই চীনারা একে একে ঘর-বাড়ী তৈরী, আগুনের ব্যবহার, দিনপঞ্জী গণনা, বাজনা তৈরী, গান করা ইত্যাদি শিখেছিল। একজন রাজা শিখিয়েছিলেন কৃষি ও চিকিৎসা বিদ্যা। হোয়াংহো নদীতে বাঁধ দেওয়ার উপায়ও একজন রাজা শিক্ষা দিয়েছিলেন। আর তাতে দেশবাসীর প্রাণও রক্ষা পেয়েছিল। পানকু বা ঐ জাতীয় রাজাদের সম্বন্ধে প্রাচীন চীনে প্রচলিত পৌরাণিক কথাগুলিতে রাজা ছিলেন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন একজন দেবদূত এবং তাঁর ক্ষমতা ভগবানেরই দেওয়া ক্ষমতা—এই কথাটা প্রচার করাই মূল উদ্দেশ্য ছিল।

কোন রাজার নির্দেশ নয়—বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারাই চীনারা উপলব্ধি করেছিল, বাঁধ না দিলে হোয়াংহোর মত চীনের দুঃখকে সুখে পরিণত করা যাবে না। সুতরাং ঐসব রূপকথাগুলি ছিল হাস্যকর, সঙ্গতিহীন এবং অবিশ্বাস্য কাহিনীতে ভরা। রাজা এবং তাঁদের অনুগামীরা নিজেদের ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠা প্রচারের জন্যই এরূপ অলৌকিক কাহিনী রচনা করিয়েছিলেন।

৫। নদী-তীরবর্তী সভ্যতার আলোকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ঃ

আজ থেকে প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগে মেসোপটেমিয়া, মিশর, ভারত ও চীনে প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে এসব সভ্যতাগুলির মধ্যে আপাত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অন্তরে অন্তরে কিন্তু সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, উল্লিখিত সব সভ্যতাগুলিরই বিকাশ ঘটেছিল নদীর তীরে—ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিসের তীরে মেসোপটেমিয়া, নীল নদের তীরে মিশর, সিন্ধু নদের তীরে ভারত এবং হোয়াংহো-ইয়াংসিকিয়াং নদীর উপকূলে ছিল চীন। নদীর পলি পড়ে ঐসব অঞ্চলে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং প্রচুর ফসল ফলে। তাই চাষবাসই ছিল প্রধান জীবিকা। দ্বিতীয়তঃ, ঐসব প্রাচীন সভ্যতাগুলিতে পাওয়া বিভিন্ন নিদর্শনের মধ্যে তামা ও ব্রোঞ্জ নির্মিত দ্রব্যই বেশি। অবশ্য

পাথর কিংবা সোনারূপার অলংকারও বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত হতো। তৃতীয়তঃ, প্রাচীন সভ্যতাগুলি থেকে পাওয়া বিভিন্ন নিদর্শন থেকে ধারণা হয়—সর্বত্রই প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশকে দেব-দেবী জ্ঞানে বন্দনা করা হতো। চতুর্থতঃ, ধনী ও দরিদ্রের জীবনধারায় পার্থক্য বজায় ছিল। পুরানো পাথরের যুগ হতেই প্রকৃতির নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা চলছিল এই প্রাচীন সভ্যতাগুলি তারই পরিণত রূপ।

এইসব সভ্যতাগুলিতে যে পরিণত রূপের বিকাশ ঘটেছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তার মূল্য অনেক। নতুন পাথরের যুগে কৃষির আবিষ্কারের পর থেকেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জনের আগ্রহ দেখা দেয়। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে এসে দেখা যায়, কেউ কেউ প্রচুর সম্পদের অধিকারী হয়ে বিত্তশালী হয়ে উঠেছে। সিন্ধু সভ্যতা ছাড়া অন্যান্য সভ্যতাগুলিতে রাজা ছিলেন সর্বশক্তিমান। কখনও কখনও রাজা নিজেকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে প্রচার করতেও দ্বিধা বোধ করেন নি। মেসোপটেমিয়া কিংবা চীনে ধর্মকর্মের ক্ষেত্রে রাজারই একক ক্ষমতা ছিল। রাজার পরে সমাজে পুরোহিতের মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা ছিল খুব বেশি। পুরোহিতেরা ধর্মের বিধান দিতেন, দৈববাণীর ব্যাখ্যা করতেন, তিথি-নক্ষত্র গণনা করতেন এবং কখনও কখনও রাজাকে বুদ্ধি-পরামর্শ দিতেন। তখন প্রধান পেশা ছিল কৃষি ও পশুপালন। এছাড়া কামার, কুমার, ছুতার, তাঁতি, স্থপতি ইত্যাদি সবারই বিশেষ গুরুত্ব ছিল। প্রত্যেকেই নিজের নিজের পেশায় নিযুক্ত থেকে জীবিকা নির্বাহ করত। মনের ভাব প্রকাশের আকুলতাকে রূপ দেবার জন্যই সমাজে লিপিমালার উদ্ভব হয়। কিউনিফর্ম, হিয়ারোগ্লিফিক, সিন্ধুলিপি ও চৈনিক লিপির উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে সমাজে সে আকুলতাকে রূপ দেবার সার্থক চেষ্টা হয়। এ যুগের মত জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার আগ্রহ তখনও ছিল। সম্ভবতঃ ঐ সভ্যতাগুলিকে বিভিন্ন শিল্পরীতি, ধর্মচর্চা, রসায়ন বিদ্যার অনুশীলন ও প্রয়োগ ইত্যাদির উৎস রূপে নির্দেশ করা যায়। টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস, নীল কিংবা হোয়াংহো নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণ সেই যুগের কারিগরি বিদ্যার উৎকর্ষতারই পরিচয় দেয়। অন্যদিকে, মিশরের পিরামিড নির্মাণে সে যুগের কারিগরি দক্ষতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সিন্ধু সভ্যতার সুপরিকল্পিত নাগরিক জীবন ও উন্নত পৌরশাসন আজও আমাদের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করে।

অর্থনৈতিক জীবনধারার রূপান্তর—সামাজিক জীবনের মত

অর্থনৈতিক জীবনধারার রূপান্তরের পরিচয়ও ঐসব প্রাচীন সভ্যতাগুলিতে মেলে। সেকালের সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ছিল। সর্বত্রই বজায় ছিল ক্রীতদাস-প্রথা। রাজার প্রাসাদ ছিল বিলাস-বহুল। ধনীরাও পাকা বাড়ীতে বাস করত। কিন্তু দরিদ্রদের বাসস্থান ছিল কুটির। ব্যবসার প্রয়োজনে যানবাহনের আবিষ্কার এবং কেনাবেচার ক্ষেত্রে বিনিময় প্রথা - ঐসব সভ্যতাগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। সমাজে ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্ভব হয়। জলপথে ও স্থলপথে এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের সূচনা এই সময়েই দেখা দেয়। বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা নিজ নিজ উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য বাজার গড়ে তোলে। গুরুত্ব ও মর্যাদার দিক থেকে এই সময় নগরগুলির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বিলাস, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামদায়ক জীবনযাত্রা ধনীদের জন্যই নির্ধারিত ছিল। দরিদ্রদের জীবন ছিল চরম দুঃখ আর দুর্দশায় ভরা।

অনুশীলনী

[ক] বড় প্রশ্ন

১। সভ্যতা বলতে কি বোঝায়? প্রাচীন যুগে কোন্ কোন্ নদীর তীরে কি কি সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল?

২। মেসোপটেমিয়া শব্দের অর্থ কি? এই অঞ্চলটি কোথায় ছিল? মেসোপটেমিয়ার সভ্যতাকে সুমেরীয় সভ্যতা বলা হয় কেন?

৩। মেসোপটেমিয়ায় জমিকে কিভাবে উর্বর করা হতো? সেখানকার খাদ্যশস্য কি কি ছিল?

৪। বিভিন্ন বিষয়ে সুমেরিয়রা কিরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল?

৫। মিশর দেশটি কোথায়? একে নীল নদের দান বলা হয় কেন?

৬। ফ্যারাও কাদের বলা হতো? তাঁদের সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৭। প্রাচীন মিশরের পুরোহিত, রাজস্ব সংগ্রহকারী এবং সৈনিকদের সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৮। পিরামিড কি? এগুলি কেন নির্মিত হতো? পিরামিড নির্মাণের ইতিহাসকে বেদনাদায়ক বলা হয় কেন?

৯। মিশরীয়দের ধর্মীয় জীবনধারার পরিচয় দাও। তাদের প্রধান প্রধান জীবিকা কি কি ছিল?

১০। কেমন করে সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে?

১১। সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের নাগরিক জীবনধারা সম্পর্কে যা জান লেখ।

১২। সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের খাদ্য ও ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্যাদি সম্পর্কে পরিচয় দাও।

১৩। সিন্ধু সভ্যতার যুগে ভারতবাসী ব্যবসা-বাণিজ্যে কিরূপ সমৃদ্ধ ছিল ?

১৪। সিন্ধু সভ্যতার যুগের সামাজিক জীবনধারা সম্পর্কে আলোচনা কর।

১৫। সিন্ধু সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা কর। এই সভ্যতা ভারতবাসীর কাছে গর্বের বস্তু কেন ?

১৬। চৈনিক সভ্যতা সম্পর্কে যা জান লেখ।

১৭। প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে কি কি সঙ্গিত ছিল ?

[খ] ছোট প্রশ্ন

১। মেসোপটেমিয়া সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কি জান ?

২। নিম্নলিখিত বর্ণলিপি সম্পর্কে যা জান লেখ—
(ক) কিউনিফর্ম, (খ) হিয়ারোগ্লিফিক।

৩। মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীদের পেশা সম্পর্কে কি জান ?

৪। সুমেরিয়ানদের কারিগরি দক্ষতা সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৫। প্রাচীন মিশরীয়দের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

৬। সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের শিল্প ও কারিগরি দক্ষতা সম্পর্কে কি জান ?

৭। চীনের পৌরাণিক কাহিনী ও তার সভ্যতা সম্পর্কে আলোচনা কর।

৮। প্রাচীন চীনে বন্যা প্রতিরোধের ব্যবস্থা কিরূপ ছিল ?

[গ] বুদ্ধির প্রশ্ন

১। অশুদ্ধ উক্তিগুলিকে শুদ্ধ কর :

(ক) নীল নদের তীরে ছিল মোপোপটেমিয়া। (খ) চীনের রাজাদের উপাধি ছিল ফ্যারাও। (গ) সুমেরিয়দের উদ্ভাবিত লিপিকে বলা হতো ব্রাহ্মী লিপি। (ঘ) মিশর দেশটি ছিল এশিয়া মহাদেশে। (ঙ) মিশরীয় লিপিমালাকে বলা হতো কিউনিফর্ম। (চ) পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য হলো মিশরের মমি। (ছ) সিন্ধু সভ্যতার যুগে বরুণ ও চন্দ্রের পূজা হতো। (জ) মহেঞ্জোদড়ো শব্দের অর্থ জীবিতের স্তূপ। (ঝ) সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা গ্রামে বাস করত। (ঞ) চীনের প্রাচীন রাজবংশের নাম হুনান। (ট) সিন্ধু সভ্যতার যুগে সমাজে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য ছিল না।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) গ্রীকদের কাছে — শব্দের অর্থ দুই নদীর — দেশ। (খ) পণ্ডিতদের মতে এই মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা - চীন ও—সভ্যতার চেয়ে প্রাচীনতর ছিল। (গ)—ছিল পর্বতাকৃতি এবং প্রায়—মিটার উঁচু। (ঘ) এই আফ্রিকা মহাদেশের একটি দেশ—, আর একটি নদ— । (ঙ) মিশরে

রাজার পরেই ছিল—স্থান। (চ) তাই—এবং—ব্যক্তিদের মৃত্যুর পরে তাদের মৃতদেহ মূল্যবান বস্ত্রদ্বারা ঢেকে রাখা হতো। (ছ) —ও —ছিল মিশরের লোকদের প্রধান জীবিকা। (জ) ১৯২২ সালে বাঙালী ঐতিহাসিক — বন্দ্যোপাধ্যায় ও—চেষ্টায়—খননকার্য চলে। (ঝ) প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা — —বাস করত। (ঞ) সিন্ধু নদের অধিবাসী শিল্পকর্মে ও—ছিল খুবই –। (ট) চীনের—ও—প্রদেশের মাটি খুঁড়ে প্রাচীন চৈনিক সভ্যতা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়।

৩। যথার্থ উত্তরটি খুঁজে (✓) চিহ্নিত কর ঃ

প্রশ্ন	উত্তর
(ক) মেসোপটেমিয়ার বর্তমান নাম কি?	মিশর / ইরাক/ সুমের।
(খ) মিশরের রাজার উপাধি কি ছিল?	রাজা / সম্রাট / ফ্যারাও।
(গ) পশুপতি শিবের মূর্তির শীলমোহর কোন্ সভ্যতার?	মিশরীয় / চৈনিক / সিন্ধু সভ্যতার।
(ঘ) উর নগরীতে খননকার্যের ফলে কোন্ সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে?	সিন্ধু / মেসোপটেমিয়া / মিশর
(ঙ) চীনের দুঃখ বলা হয় কোন্ নদীকে?	নীল নদ / হোয়াংহো / ইউফ্রেটিস।
(চ) সুমেরিয়দের লিপিমালাকে কি বলে?	কিউনিফর্ম / হিয়ারো-গ্লিফিক / ব্রাহ্মীলিপি

[ঘ] মৌখিক প্রশ্ন

(ক) নদীমাতৃক সভ্যতা বলতে কি বোঝ? (খ) গ্রীকদের মতে মেসোপটেমিয়া শব্দের অর্থ কি? (গ) মমি কি? (ঘ) জিগুরেট বলতে কি বোঝ? (ঙ) অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ কাকে বলে? (চ) সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন কাদের চেষ্টায় আবিষ্কৃত হয়েছে? (ছ) হোয়াংহোকে চীনের দুঃখ বলা হয় কেন? (জ) পান্কু কে ছিলেন? (ঝ) চীনারা কোন্ জাতি গোষ্ঠীর অন্তর্গত? (ঞ) "ইন বংশের স্তূপ" কাদের রাজধানী ছিল? (ট) মেসোপটেমিয়া বা চীনে একক ক্ষমতা ছিল কার? (ঠ) চৈনিক লিপি বলতে কি বোঝ? (ড) ধনীরা কি রকম বাড়ীতে বাস করত? (ঢ) দরিদ্রেরা কি রকম বাড়ীতে বাস করত? (ণ) রাজার পরেই সমাজে মর্যাদা পেত কারা?

[ঙ] মানচিত্র অঙ্কন :

১। পৃথিবীর একটি মানচিত্র এঁকে মেসোপটেমিয়া, মিশর, ভারত ও চীনের কোথায় কোথায় প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল তা দেখাও।

———

লৌহযুগীয় সমাজ

সূচনা—এর আগের অধ্যায়ে তোমরা দেখেছ তামা ও ব্রোঞ্জের আবিষ্কার আদিম মানুষের জীবনধারায় গভীর পরিবর্তন এনেছিল। এই অধ্যায়ে আমরা পড়ব মানবজাতির ইতিহাসে আর একটি যুগান্তরকারী আবিষ্কারের কথা। সেটা হলো লোহা।

১। লোহার আবিষ্কার ও এর ব্যবহার ও প্রভাব :

উপযোগিতা ও গুরুত্বের দিক থেকে তামা ও ব্রোঞ্জের চেয়ে লোহার মূল্য অনেক বেশি। তামা ও ব্রোঞ্জের চেয়ে লোহার ওজন বেশি এবং সহজলভ্য। খ্রীস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে সম্ভবতঃ আফ্রিকার বন্য কাফ্রিরা এই ধাতুর আবিষ্কার করে। আনুমানিক ১৪০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে এসিয়া মাইনরের **হিট্টিস** নামে উপজাতীয় যাযাবরেরা লোহার ব্যাপক প্রয়োগ করতে থাকে। আনুমানিক ১২০০খ্রীস্ট পূর্বাব্দে প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, তুরস্ক, ইরাক, ইরাণ এবং গ্রীস দেশে লোহার ব্যবহার শুরু হয়। আমাদের ভারতবর্ষে গঙ্গা-যমুনার উপকূলবর্তী দোয়াব অঞ্চলে লোহার ব্যবহার আরম্ভ হয় আনুমানিক ১০০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে। এইভাবে লোহার আবিষ্কার এবং দেশ-বিদেশে তার ব্যাপক প্রয়োগের দ্বারা মানুষের জয়যাত্রার ইতিহাসে যুগান্তর ঘটে। কৃষির কাজে লাঙ্গল, কাস্তে ও যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র এর পর থেকে লোহার দ্বারাই তৈরী হতে থাকে। লোহার তৈরী অস্ত্র দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে এখন থেকে ধীরে ধীরে জনবসতি গড়ে ওঠে। লোহার কুঠার দিয়ে গাছ কাটা হতে লাগল। নির্মিত হল নানান ধরনের যন্ত্রপাতি। এভাবে কারিগরি বিদ্যার সমৃদ্ধি ঘটল।

২। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য :

আগেই বলেছি, উপযোগিতার দিক থেকে লোহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধাতু। লোহার কুঠার দিয়ে জঙ্গল কেটে জনবসতি গড়ে উঠল। রাজারাও ঢাল, তলোয়ার, বর্শা জাতীয় অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করতে লাগলেন। যে রাজা অস্ত্র বলে যত বলীয়ান হতেন তার পক্ষে তত সহজে প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রাখা সম্ভব হতো। চাষের কাজেও কোদালের উপযোগিতা বেড়ে গেল।

কোদাল দিয়ে মাটি কোপানোর ফলে জমিকে উর্বর ও কৃষিযোগ্য করে তোলা সহজসাধ্য হয়ে উঠল। বিত্তশালী লোকেরা তাই এই ধাতু দিয়ে যন্ত্রপাতি নির্মাণে উদ্যোগী হলো। এমনিভাবে সামাজিক জীবনধারায় দেখা দিল পরিবর্তন।

অর্থনৈতিক দিক থেকেও লোহার আবিষ্কার পূর্বের জীবনধারাকে অনেকখানি পালটে দিল। একদল কারিগর লোহার যন্ত্রপাতি তৈরী করে দক্ষতা অর্জন করল। অল্প দিনেই তার চাহিদা বেড়ে গেল। ওজন পরিমাপের জন্যও লোহার ব্যবহার শুরু হল। এক কথায় বলা চলে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও চাহিদা আরও বাড়িয়ে তোলার জন্য সর্বপ্রকারে এই ধাতুর ব্যাপক ব্যবহার শুরু হতে লাগল। এর ফলে পূর্বের জীবনধারা ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়ে এক নূতন রূপ নিল।

৩। রাজশক্তির প্রসার ঃ

লোহার অস্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে একদল যাযাবর জাতি দেশে-দেশান্তরে খাদ্য ও বাসস্থানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। কৃষিযোগ্য ভূমি ও বাসযোগ্য আবহাওয়া দেখে কোন বিশেষ অঞ্চল বেছে নিয়ে সেখানে তারা বসতি গড়ে তুলল। পরে তাদের দলপতি হলেন রাজা। এইভাবে সেই প্রাচীন যুগের ইতিহাসে দেখা যায়, রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। শক্তিবলে বলীয়ান ছিলেন যে রাজা—তিনি সর্বদা চেষ্টা করতেন দুর্বল জাতিগুলিকে পদানত করে তাঁর সাম্রাজ্যের সীমানা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করতে। এইভাবে সেই আদিযুগে নূতন নূতন রাজা, নূতন নূতন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। এমনি করেই সেই প্রাচীন যুগে শুরু হয়েছিল এপার ভাঙা ওপার গড়ার এক নূতন অধ্যায়।

অনুশীলনী

(ক) বড় প্রশ্ন

১। লৌহ ব্যবহারের ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারার কি কি পরিবর্তন ঘটে ?

২। লৌহ আবিষ্কারের ফলে রাজশক্তির কিভাবে প্রসার হয় ?

৩। লৌহ আবিষ্কার করে কারা এবং কিভাবে এর ব্যাপক প্রয়োগ ঘটে ?

(খ) ছোট প্রশ্ন

১। কোন্ কোন্ দিক থেকে তামা ও ব্রোঞ্জের চেয়ে লোহার উপযোগিতা বেশি ?
২। লোহার আবিষ্কারের ফলে কৃষির কিভাবে উন্নতি ঘটে ?
৩। প্রাচীন যুগে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কিভাবে সম্ভব হয়েছিল ?

(গ) বুদ্ধির প্রশ্ন

১। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) উপযোগিতা ও——দিক থেকে তামা ও——চেয়ে——মূল্য অনেক বেশি। (খ) লোহার তৈরী——দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে এখন থেকে——গড়ে ওঠে। (গ) ——বলীয়ান ছিলেন যে রাজা তিনি সর্বদা চেষ্টা করতেন——জাতিগুলিকে পদানত করে তাঁর সাম্রাজ্যের——ও প্রভাব-প্রতিপত্তি——করতে।

২। ভুল উক্তিগুলিকে শুদ্ধ করে লেখ ঃ

(ক) উপযোগিতার দিক থেকে লোহার চেয়ে তামা ও ব্রোঞ্জের উপযোগিতা খুব বেশি। (খ) আনুমানিক ২০০০ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দে সম্ভবতঃ এশিয়া মাইনরের বন্য কাফ্রিরা সর্বপ্রথম লোহার ব্যাপক প্রয়োগ করতে থাকে। (গ) চাষের কাজেও তামা ও ব্রোঞ্জের কোদালের গুরুত্ব খুব বেশি। (ঘ) লোহার অস্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে একদল সুসভ্য জাতি দেশ-দেশান্তরে খাদ্য ও বাসস্থানের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়ল।

(ঘ) মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) প্রথম কারা এবং কবে লোহার আবিষ্কার করে ? (খ) লোহার ব্যাপক ব্যবহার শুরু করে কোন্ জাতি ? (গ) ভারতে কোথায় এবং কবে সর্বপ্রথম লৌহ আবিষ্কৃত হয় ? (ঘ) লোহার তৈরী কয়েকটি অস্ত্রের নাম কর। (ঙ) কাঠ কাটার জন্য লোহার তৈরী কোন্ যন্ত্রের দরকার হয় ? (চ) কোদাল দিয়ে কি কাজ করা হয় ?

পঞ্চম অধ্যায়

লৌহযুগের সভ্যতার সূচনা ঃ নূতন জাতি ও সাম্রাজ্যের পত্তন

প্রথম পরিচ্ছেদ

[ব্যাবিলন * মিশর • ইরাণ * ইহুদী]

সূচনা—ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস, নীল, সিন্ধু বা হোয়াংহোর তীরে নদী-মাতৃক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল—সেখানকার অধিবাসীরা সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা ভূমিতে স্থায়ী বাসস্থান গড়ে তুলেছিল। কিন্তু এর পরবর্তী-কালে প্রাচীন ইতিহাসে পশুপালক এক নূতন যাযাবর জাতির অভ্যুদয় ঘটে। এরা খাদ্য ও বাসস্থানের সন্ধানে দিশেহারাভাবে ঘুরতে ঘুরতে উর্বর ভূমি-খণ্ডের সন্ধান পেয়ে বাসস্থান গড়ে তোলে। পরে সেখানকার পুরানো বাসিন্দাদের পরাস্ত করে, যাযাবরী জীবন ত্যাগ করে এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে দেয়। সুসভ্য জাতির সংস্পর্শে এসে এদের জীবনধারার পরিবর্তন ঘটে। পরবর্তীকালে তারা পূর্বের সুসভ্য জাতিগুলির মত মানবসভ্যতার ভাণ্ডারকে নূতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির অসামান্য অবদানে সমৃদ্ধ করে তোলে। অন্যদিকে রাজ্য জয়ের নেশায় উন্মত্ত হয়ে গড়ে তোলে নূতন সাম্রাজ্য। এমনি করেই বিভিন্ন যুগে চলে ইতিহাসের পালাবদল।

১। ব্যাবিলনের সভ্যতা ঃ

তোমরা আগেই পড়েছ—ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে সুমেরিয়ান জাতি একদিন মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যান্য জাতিগুলির যেভাবে পতন ঘটেছিল তেমনি ভাবেই বোধ হয় ঘরোয়া ঝগড়া এবং বাইরের শত্রুর একটানা আক্রমণে সুমেরিয়দের পতন ঘটে। তোমাদের হয়ত বা মনে হবে তাহলে মেসোপটেমিয়ার সভ্যতারও কি বিনাশ ঘটেছিল? না, মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার যা কিছু অবদান তা অক্ষুণ্ণ রেখে পরবর্তীকালে ব্যাবিলন বা

অ্যাসিরিয়ানরা এই প্রাচীন সভ্যতাকে আরও সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত করে তোলে। বর্তমান অধ্যায়ে, আমরা তারই পরিচয় জানার চেষ্টা করব।

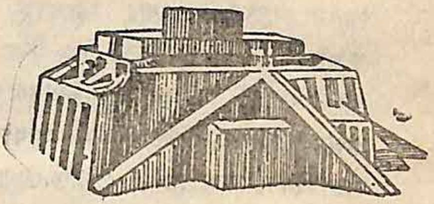
মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণাংশকে বলা হত ব্যাবিলনিয়া। ব্যাবিলনিয়ার অধিবাসীরা প্রথমে ছিল যাযাবর। ওদের বাসস্থান ছিল আরব দেশের মরুপ্রান্তরে। প্রধান জীবিকা ছিল পশুপালন। আনুমানিক ২০০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে তারা খাদ্য, বাসস্থান ও পশুচারণযোগ্য ভূমির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। পরে তারা ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস নদীতীরে এসে ঘরোয়া ঝগড়াবিবাদে দুর্বল সুমেরিয়দের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আর সুমেরিয়রা তাদের হাতে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে। তখন তারা গড়ে তোলে নূতন রাজধানী—ব্যাবিলন। সেজন্য ইতিহাসে ওদের বলা হয় ব্যাবিলনের অধিবাসী এবং ওদের সভ্যতা হল ব্যাবিলনের সভ্যতা। শীঘ্রই সম্পূর্ণ মেসোপটেমিয়া ওদের অধীনে আসে। সুমেরিয়দের উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে ব্যাবিলনের অধিবাসীরা সুসভ্য হয়ে ওঠে। জন্ম দেয় এক নূতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির। এতে মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার নব রূপায়ণ ঘটে।

(ক) **কৃষি ও বাণিজ্য ঃ** ব্যাবিলনের অধিবাসীদের প্রথমে জীবিকা ছিল পশুপালন। গরু, ভেড়া, উট ছিল প্রধান পশু। এরপর তারা সুমেরিয়দের মত চাষবাস শুরু করে। অল্প দিনেই তারা কৃষিকার্যে দক্ষতা অর্জন করে এবং তা তাদের প্রধান জীবিকা হয়ে ওঠে। মেসোপটেমিয়ার উর্বর কৃষিক্ষেত্র তারা প্রচুর ফসল ফলাত। খাদ্যশস্য ছাড়াও তারা বিভিন্ন ফলের চাষ করত।

ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাবিলনের অধিবাসীরা খুবই পারদর্শী ছিল। ব্যাবিলন ছিল একটি প্রধান বাণিজ্যনগরী। এখানে দেশ-বিদেশ থেকে সওদাগরেরা আসত। কেনা-বেচার জন্য এখানে গড়ে উঠেছিল বড় বড় বাজার। ব্যবসায়ীদের সমাজে বিশেষ মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা ছিল। তারা দেশের সর্বত্র অবাধে গমনাগমন করতে পারত। দূর দেশের সঙ্গে জলপথে তাদের ব্যবসা চলত। বিশেষ করে মিশর ও ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদের জলপথে বাণিজ্য চলত। তখন ব্যাবিলন নগরী ছিল একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র।

(খ) **মন্দির ও পুরোহিত সম্প্রদায় ঃ** সুমেরিয়ানদের মত ব্যাবিলনের অধিবাসীদের জীবনে ধর্ম খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রত্যেক

নগরীর বিশেষ দেব-দেবী ও মন্দির ছিল। মন্দিরগুলি ছিল উঁচু ও কিছুটা গম্বুজাকৃতি। তাদের প্রধান দেবতা ছিলেন মারডুক। এছাড়া ন্যান্নার চাঁদের, স্যামাস্ সূর্যের, এবং ঈশহৃতার ছিলেন প্রেমের দেবতা। গম্বুজাকৃতি অনেক উঁচু মন্দিরকে বলা হত জিগ্গুরেট। জিগ্গুরেটগুলির ওপরে থাকত চূড়া এবং সেই চূড়ার ওপরটা হত বেশ প্রশস্ত। তার ওপর থাকত আর একটা মন্দির। সেটার পাশে আরও অনেকগুলি মন্দির – যেন অনেকগুলি পাহাড়ের সারি। সমাজে পুরোহিত সম্প্রদায়ের যথেষ্ট মর্যাদা, প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা ছিল। ধর্মানুষ্ঠান ও শিক্ষাদান ছাড়াও ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজনে শাসনকার্য পরিচালনা ব্যাপারে তাঁরা অংশগ্রহণ করতেন।



ব্যাবিলনের মন্দির

(গ) **শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতি** :—সুমেরিয়ানদের সংস্পর্শে এসে ব্যাবিলনের অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়। জ্যোতির্বিদ্যার ব্যাপক অনুশীলন চলে। সূর্যের ছায়ার উপর নির্ভর করে তারা নির্মাণ করে সময় নির্দেশক ঘড়ি। আবার জলের প্রবাহকে নিয়ে তারা বানায় জলঘড়ি। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অবস্থান অনুযায়ী মানুষের ভাগ্য নিরূপণ সম্বন্ধেও তারা চিন্তা করত। ৬০ সেকেণ্ডে এক মিনিট, ৬০ মিনিটে এক ঘণ্টা, ২৪ ঘণ্টায় একদিন, ৩০ দিনে এক মাস এবং ৩৬৫ দিনে এক বছরের গণনা প্রথম এই ব্যাবিলনের অধিবাসীরাই করেছিল। সুমেরিয়ানদের কিউনিফর্মের বর্ণলিপি সংখ্যা ব্যাবিলনের পণ্ডিতদের ব্যাপক চর্চার ফলে আরও কমে আসে ও বিচিত্র জ্ঞানচর্চার মাধ্যম হয়।

(ঘ) **হামুরাবির কোড বা বিধান**— ব্যাবিলনের সবচেয়ে সমৃদ্ধি ও বিকাশ দেখা দেয় হামুরাবির রাজত্বকালে। তিনি ছিলেন একজন প্রজারঞ্জক ও সুবিচারক সম্রাট। তাঁর মত সুশাসক শুধু ব্যাবিলনে নয় সমগ্র পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসে বিরল। রাজ্যবিজেতা হিসেবেও তাঁর কৃতিত্ব ও দক্ষতা ছিল অতুলনীয়।

হামুরাবির রাজত্বকালে দেশের আইনকানুন বিধিবদ্ধ করা হয়। তিনি একটি কালো উঁচু পাথরের গায়ে সেইসব আইনগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখেন। এগুলিকে বলা হয় **হামুরাবির কোড বা বিধান**। তাতে সর্বস্তরের প্রজাদের

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের নির্দেশ দেওয়া আছে। হামুরাবির কোডে উল্লিখিত কয়েকটি প্রধান প্রধান নির্দেশ ছিল : (১) আইনের দৃষ্টিতে সকল প্রজাই সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকারী। (২) অপরাধীদের বিচার করবেন রাজা। (৩) প্রত্যেকেই নিজ নিজ পেশায় নিযুক্ত থেকে সমাজের সেবা করবে। (৪) ক্রীতদাসদের ন্যায্য মজুরি বঞ্চিত করা চলবে না। (৫) স্ত্রী-লোকদেরও পুরুষের সমান অধিকার দিতে হবে। (৬) দেশের প্রয়োজনে খাল খনন, রাস্তা তৈরীর প্রভৃতি উন্নয়নমূলক ও সংস্কারমূলক কাজে প্রত্যেক নাগরিককেই অংশ গ্রহণ করতে হবে।

হামুরাবির বিধানে উল্লিখিত সমাজ চিত্র—হামুরাবির বিধিবদ্ধ আইনে ন্যায়-নীতি-আদর্শের যে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তা সত্যই অভিনব। রাজার দেশরক্ষা ও দেশশাসনের প্রধান ভিত্তি ছিল প্রজা। তখন সমাজে ধনী-অভিজাত ও ক্রীতদাস এই দুই শ্রেণী ছিল। ধনীরা অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করত। প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান ও সম-অধিকারের সমুন্নত আদর্শের উল্লেখ এখানে আছে। তখন সমাজে অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো। বেগার খাটান চলত না। কেউই নিজের হাতে আইন গ্রহণ করতে পারতেন না। রাজাই ছিলেন সর্বোচ্চ শাসক। সমাজে ক্রীতদাস প্রথা ছিল। কিন্তু তাদের ন্যায্য মজুরি দানের উল্লেখ হামুরাবির বিধানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাজা যে স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না—এটা তাতেই প্রমাণিত হয়। অন্যদিকে নারীর স্বাধীনতা দানের উল্লেখও এই বিধানের আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। আজ থেকে সহস্রাধিক বছর আগে এরূপ ন্যায়নীতি ও উদার আদর্শের পরাকাষ্ঠা সত্যই যুগান্তকারী ব্যাপার।

হামুরাবির মৃত্যুর পরে তাঁর দুর্বল ও অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকালে বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঘটে। আসীরিয় নামে এক জাতি সমগ্র ব্যাবিলনে নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন করে। আসীরিয়রা ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিসের উপকূলে এক ক্ষুদ্র অংশে রাজত্ব করত। এবার তারা ব্যাবিলন জয় করে এবং সমগ্র মেসোপটেমিয়ায় নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। তাদের রাজধানী ছিল নিনেভ্ নগরী। আসুরবানিপল ছিলেন আসীরিয়দের শ্রেষ্ঠ রাজা। নিনেভ্ নগরীর ভগ্নস্তূপ খননের ফলে তা আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব নিদর্শন থেকে আসীরিয়দের উন্নত সভ্যতার পরিচয় মেলে। আসীরিয়রা ব্যাবিলন ও সুমেরীয় সভ্যতার পূর্বাপর ধারাকে অনুসরণ করে এক নূতন

সভ্যতার জন্ম দেয়। তাদের সাম্রাজ্য সেই যুগে বহুদূরব্যাপী প্রসারিত হয়েছিল।

আসীরিয়রা ছবি আঁকা, ভাস্কর্য ও খোদাইয়ের কাজে খুবই নিপুণ ছিল। নিনেভের ভগ্নস্তূপে পোড়া ইঁটের ফলকে লেখা গ্রন্থরাজিপূর্ণ এক গ্রন্থাগারের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গেছে। খ্রীস্টপূর্ব সপ্তম শতকে মীড নামে এক জাতির আক্রমণে আসীরিয় সাম্রাজ্যের বিনাশ ঘটে। তখন চ্যালডিয়ানেরা ব্যাবিলনে আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়। সম্রাট দ্বিতীয় নেবুকাডনেজার চারদিকে প্রাচীর দিয়ে ব্যাবিলন নগরীকে সুরক্ষিত করে তোলেন। বহু রাস্তাঘাট, তোরণ ও মন্দির প্রভৃতি নির্মাণ করান। তাঁর রাজত্বকালে ব্যাবিলন ছিল প্রাচীন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী নগরী। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান অক্ষয় কীর্তি। আজও তা বিশ্বের বিস্ময়রূপে বিরাজিত।

২। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে মিশরের আত্মপ্রকাশ ঃ

ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক দিক থেকে মিশর ছিল সুরক্ষিত। এ দেশের উত্তরে সমুদ্র, পূর্বে ও পশ্চিমে মরুভূমি এবং দক্ষিণে পর্বত। এজন্য দীর্ঘকাল ধরে এখানে কোন বিদেশী জাতির অভিযান ঘটেনি। ফ্যারাওরা প্রায় দেড় হাজর বছর ব্যাপি এখানে অপ্রতিহত বিক্রমে রাজত্ব করেছিলেন। এই সময়ে একের পর এক বহু রাজবংশের উত্থান-পতন ঘটে। মিশরে এইভাবে বারোটি রাজবংশের ধারাবাহিক শাসনের পর ফ্যারাওদের দুর্বলতা ও মিশরবাসীর রণপটুতার অভাবের সুযোগ হিক্‌সস্ নামে এক যাযাবর জাতি ঘোড়ায় টানা রথে চেপে এসে মিশরে হানা দেয়। ফ্যারাওরা দেশ শাসন ও প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের কথা ভুলে তখন আরাম, সুখ ও বিলাসে মত্ত হয়েছিলেন। মৃত্যুর পরে পাতালে ওসিরিসের রাজ্যে গিয়ে কত তাড়াতাড়ি নূতন জীবন শুরু করতে পারবেন তারই জন্য পিরামিড নির্মাণের ভাবনাই ফ্যারাওদের কাছে বড় হয়ে ওঠে। এজন্য দেখা দেয় অনৈক্য, বিশৃংখলা এবং ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা। তারই সুযোগ হিক্‌সসেরা এখানে হানা দিয়ে সহজেই জয়ী হয়। প্রায় শতাধিক বছর ধরে তারা একটানা এদেশ শাসন করে।

কিন্তু এমনি করে চিরদিন চলল না। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় যতই কুশলী হোক না কেন, মিশরীয়দের রণপটুতার অভাব ছিল। তবে হিক্‌সস্‌দের নিকট তারা যুদ্ধবিদ্যা শিখে তলে তলে আঘাত হানার জন্য বহুদিন ধরে প্রস্তুতি

নিল। তারপর একদিন সুযোগমত হিক্‌সস্‌দের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে মিশরীয়রা সহজেই সাফল্য অর্জন করল। দীর্ঘকাল ঘৃণ্য পরাধীন জীবন-যাপন করার পর নূতন করে স্বাধীনতার স্বাদ পেল।

উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্রষ্টা প্রাচীন মিশরবাসী ছিল শান্তিপ্রিয় ও ঘরমুখী। এবার তারা যুদ্ধের স্বাদ পেয়ে নূতন সাম্রাজ্য স্থাপনে উৎসাহিত হয়ে উঠল। প্রথমেই তারা ঘৃণিত হিক্‌সস্‌দের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন। এরপর তাদের নূতন সাম্রাজ্য স্থাপনের আগ্রহ ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল।

উপনিবেশ স্থাপন—আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকে পর পর সতেরটি রাজবংশের পতনের পর চলছিল অষ্টাদশ রাজবংশের রাজত্ব-কাল। এই বংশের প্রথম আহমিস নামে একজন ফ্যারাও হিক্‌সস্‌দের যুদ্ধে পরাজিত করেন। হিক্‌সসেরা পরাজিত হয়ে মিশর ত্যাগ করে।


তৃতীয় থোটমোস

তৃতীয় থোটমোস ছিলেন খুবই শক্তিমান, রণকুশলী এবং দিগ্বিজয়ী ফ্যারাও। প্রথমে তিনি ছিলেন থিবস্‌ নগরীর আমন মন্দিরের একজন সাধারণ পূজারী। পরে পুরোহিত থেকে নিজ কর্মদক্ষতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির বলে তিনি ফ্যারাও হন। তিনি তাঁর বাহুবলে এসিয়ার পশ্চিম অংশে বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। সেই সাম্রাজ্য দক্ষিণ-পূর্ব ইথিওপিয়া থেকে পূর্বে মেসোপটেমিয়ার ইউফ্রেটিস নদীর তীর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। তৃতীয় থোটমোসের বিজয় অভিযানের কাহিনী সে যুগের চিত্রলিপিতে মুদ্রিত হয়ে আছে। তাঁর নৌ-বাহিনী ছিল খুবই শক্তিশালী এবং তাঁর যুদ্ধজাহাজ পরাক্রমের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরে পরিক্রমা করত। তাঁর রাজত্বকালে মিশরের অভ্যন্তরীণ দিক থেকেও যথেষ্ট সমৃদ্ধি ঘটেছিল।

পুরোহিতদের প্রাধান্য—পূর্বেই বলা হয়েছে, মিশরের অষ্টাদশ বংশীয় ফ্যারাও তৃতীয় থোটমোস প্রথম জীবনে আমন দেবতার মন্দিরের একজন সামান্য পুরোহিত ছিলেন। পরে তিনি তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তির দ্বারা ফ্যারাও হন এবং সমগ্র মিশরে তাঁর কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। এ থেকে সহজেই অনুমান করা চলে সেকালে মিশরে পুরোহিতেরা কেমন প্রভাবশালী ছিলেন। আমন, রা প্রভৃতি দেবতার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এমনি করে পুরোহিতদেরও ক্ষমতা বেড়ে যায়। তখন প্রধান পুরোহিতের ক্ষমতা ছিল ফ্যারাও-এর মত। তাঁরা নিজেদের দেব-দেবীর প্রতিনিধিরূপে প্রচার করতেন। মৃত্যুর পরে ওসিরিসের রাজ্যে গিয়ে নূতন জীবন এবং অনন্ত সুখভোগের পথ নির্দেশ করে দিতেন তাঁরা। অন্ধ বিশ্বাসে মিশরবাসী তাই অবনত মস্তকে পুরোহিতদের বিধি-বিধান মেনে চলত। এমনকি ফ্যারাওরাও পুরোহিতের স্বেচ্ছাচার এবং ধর্মের নামে ভণ্ডামির বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করবারও দুঃসাহস দেখাতে পারতেন না।

৩। ইরাণ :

নদীর স্রোতে যেমন একটা পাড় ভাঙে, পলি পড়ে নূতন পাড় গজায়—ইতিহাসের কালস্রোতেও তেমনি একটি জাতির পতনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন আর একটি জাতির উত্থান ঘটে। এই ভাঙা-গড়ার খেলা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে এসেছে বলেই ইতিহাসে বৈচিত্র্য ও আনন্দের রসদ মেলে। ইরাণীদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বার বার এই কথাই মনে জাগে।

আর্য ভাষাভাষী যে যাযাবর জাতিগোষ্ঠী এসিয়া-ইউরোপের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল ইরাণীরা সেই আর্য জাতিরই একটি শাখা। এদের আদি বাসস্থান নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদের অন্ত নেই। কেউ বলেন, ডেনিয়ুব নদীতট (অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী) ও দক্ষিণ রাশিয়ায় তারা প্রথম বাস করত। আবার কারও মতে তাদের আদি বাসস্থান ছিল মধ্য এসিয়ায়। সে যাই হোক ভারতে যে আর্যেরা এসেছিল তাদেরই একটি শাখা হল ইরাণী বা পারসিক। খাদ্য, বাসস্থান ও পশুচারণযোগ্য ভূমির সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে একদিন এখানে এসে হাজির হয়েছিল ইরাণী বা পারসিকরা।

(ক) **পারস্যের উত্থান**—খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে ইরাণে (নামান্তরে পারস্যে) অ্যাকামেনিড বংশীয়রা একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। প্রায় দুই শতকব্যাপী এই সাম্রাজ্য স্থায়ী হয়েছিল। এই অ্যাকা-

মেনিড বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন **কাইরাস**। কাইরাস ব্যাবিলনের অধিবাসীদের পরাজিত করে এসিয়া মাইনর পর্যন্ত পারস্য সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। এরপর তাঁর উত্তরাধিকরী **প্রথম দরাইউসের** রণনৈপুণ্যে একে একে সমগ্র ইরাণ, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, মিশর, এসিয়া মাইনর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারত জুড়ে এক বিশাল পারসিক সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। **পার্সোপোলিস** ছিল তাঁর রাজধানী এবং ঐ যুগের একটি উল্লেখযোগ্য নগরী ছিল **সুসা**। প্রথম দরাইউসের শাসনে ইরাণে শিল্প ও স্থাপত্যের সমৃদ্ধি দেখা দেয়।

এই সময়ে গ্রীকদের উত্থান ঘটে। দরাইউস এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে চলে তাদের সংঘর্ষ। শেষ পর্যন্ত তৃতীয় দরাইউসের রাজত্বকালে মহাবীর আলেকজাণ্ডারের হাতে পরাজয়ের ফলে অ্যাকামেনিড সম্রাটদের অধিকারভুক্ত বিশাল সাম্রাজ্যের বিনাশ ঘটে। ইরাণীদের জয়যাত্রা ব্যাহত হয়। আলেকজাণ্ডার বিরাট পারস্য সাম্রাজ্যের অধিকাংশ জয় করেন। এভাবে আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে গ্রীকশক্তির উত্থান ও পারসিকদের বিনাশ ঘটে।

(খ) **জরথুস্ট্র ও তাঁর ধর্মমত**—ইরাণীরা এক সময়ে বহু দেব-দেবীর পূজা করতেন। ইরাণীরা অগ্নিকে বৈদিক আর্যদের মত দেবতাজ্ঞানে বন্দনা করতেন। ইরাণীদের মধ্যে **জরথুস্ট্র** নামে একজন ধর্মসাধকের আবির্ভাব ঘটে। তিনি ইরাণীদের পূর্বের ধর্মকে নূতন রূপ দেন। বহু দেব-দেবীর পরিবর্তে ইরাণীদের মধ্যে প্রবর্তিত হয় আহুরা-মাজদার পূজা। তিনি প্রচার করেন—সত্য, ন্যায় ও আদর্শ ধর্মের দেবতা হলেন **আহুরা-মাজদা**। তিনিই মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণের কারণস্বরূপ। তাঁর শত্রু আহরিমান্ হলেন অপদেবতা এবং অকল্যাণ ও অশুভ শক্তির প্রতীক। আহুরা-মাজদার হাতে তিনি পরাজিত হন। কারণ সত্য, ন্যায় ও পবিত্রতার আদর্শ সকলেরই কাম্য। জরথুস্ট্র যে ধর্মীয় উপদেশ দিতেন তা **অবেস্তা** বা **আবেস্তা** নামে ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত আছে। ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য জাতীয় দেবতাগণ অবেস্তায় অসুররূপে বর্ণিত হয়েছে। ইরাণীরা জরথুস্ট্রের ধর্মীয় মতবাদে বিশ্বাসী। অগ্নিই ছিলেন তাঁদের প্রধান দেবতা। এই অগ্নিই ইরাণীদের ধর্মীয় গ্রন্থে বর্ণিত বাস্তু-দেবতা। ইরাণীদের পূজা-পদ্ধতি ছিল সরল। বেদের সঙ্গে ইরাণীদের ধর্মগ্রন্থ অবেস্তার বহু দিক থেকে মিল আছে।

জরথুস্ট্র অগ্নি-বন্দনার প্রচলন করেন। কারণ তাঁদের ধারণা ছিল

আগুনে সমস্ত পাপ পুড়ে জ্বলে ওঠে সত্যের এক জ্যোতির্ময় আলোক। তাই পূজা বা যজ্ঞে অগ্নি ছিল খুবই অপরিহার্য। খুব সম্ভব ইরাণীরা মৃত্যুর পরেও মৃতদেহ যাতে দেবসেবায় লাগতে পারে সেজন্য মৃতদেহ একটা খোলামেলা জায়গায় ফেলে রাখত। পরে তা কুকুর ও শকুনিকে দিয়ে খাওয়ান হতো।

জরথুস্ত্রের মৃত্যুর পরে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ইরাণীদের প্রভাব লোপ পায়। ওরা বিভিন্ন দেশে ধর্মপ্রচারে উদ্যোগী হয়। আমাদের ভারতবর্ষেও ইরাণীদের একটি দল এখনও অগ্নির পূজা এবং অবেস্তার নির্দেশগুলি মেনে চলে। এদের বলা হয় **পার্সী**। বোম্বাই রাজ্যে এখনও প্রায় দেড় লক্ষ অগ্নি-পূজারী **পারসিক** বাস করেন। এঁরা সাধারণ লোকের কাছে পার্সী নামে পরিচিত।

৪। ইহুদি :

ইহুদিরা ছিল যাযাবর ও সেমিটিক জাতি গোষ্ঠীর একটি শাখা। সম্ভবতঃ আরবের মরু-প্রান্তরে ছিল এদের আদিনিবাস। তারা নিজেদের এব্রাহামের বংশধর বলে পরিচয় দেয়।

এব্রাহামের নেতৃত্বে ইহুদিরা একদিন সুমের অঞ্চলের উর থেকে যাত্রা শুরু করে। চলতে চলতে তারা দক্ষিণ-পশ্চিমে প্যালেস্টাইনে আসে। তারপর আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয়। তারা জর্ডন নদীর তীরে ক্যানানে পৌঁছায়। স্বদেশ ছাড়া ইহুদিরা শস্যশ্যামলা, সুজলা-সুফলা অঞ্চল দেখে আত্মহারা হয়ে ওঠে। এব্রাহামকে ইহুদিদের দেবতা জিহোবা নির্দেশ দিলেন, 'এব্রাহাম শোন। এই যে সুন্দর দেশ দেখছ এখানে তোমরা বাস কর। এ দেশ আমি তোমাদের দিলাম।'

এব্রাহাম প্রসন্নচিত্তে দৈবাদেশ মেনে নিলেন। ইহুদিরা এভাবে এখানে বসতি গড়ে তুলল। যাযাবর জীবন ছেড়ে দিয়ে এখানে কিছুকালের জন্য স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করল।

এব্রাহামের ছেলের নাম জেকব—তাঁর অন্য নাম **ইসরালাইট**। তাঁদের ভাষা 'হিব্রু' ছিল সেমিটিক ভাষার অন্য আর এক শাখা। এব্রাহামের নেতৃত্বে ইহুদিদের প্যালেস্টাইনে আগমনের কাহিনী বাইবেলের **ওল্ড টেস্টামেন্টে** সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

(ক) **মিশরীয়দের অধীনে ইহুদি**—প্যালেস্টাইন ছিল মিশরীয়দের অধিকৃত অঞ্চল। হিকসসদের সঙ্গে ইহুদিদের বেশ সদ্ভাব ছিল। তাই

হিক্‌সসেরা পরাজিত হওয়ার পরে ফ্যারাওরা ইহুদিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। যাযাবর ইহুদিরা ছিল তখনও অসংগঠিত, মিশরীয়দের মত প্রবল প্রতিপক্ষের সংগে সংঘর্ষ চালাবার মত তাদের শক্তি বা সাধ্য ছিল না। সেজন্য শীঘ্রই ইহুদিরা মিশরীয়দের কাছে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণে বাধ্য হল। ইহুদিদের মিশরে ক্রীতদাস রূপে চালান দেওয়া হয়। সেখানে তারা ঘৃণ্য ক্রীতদাসের জীবনযাপন করত। কিন্তু উন্নত সভ্যতার অধিকারী মিশরীয়দের অধীনে থেকে যাযাবর ইহুদিরা পূর্বের জীবন ত্যাগ করে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হয়ে ওঠে। সৌভাগ্যবশতঃ ইহুদিদের মধ্যে **মোজেস** নামে একজন ধর্মগুরুর আবির্ভাব হয়। তাঁর শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে ইহুদিরা মিশরীয়দের অধীনতা মুক্ত হয়ে নূতন জীবনের সন্ধানে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে। মিশরের পূর্বদিকে মরু প্রান্তর পেরিয়ে তারা লোহিত সাগরের তীরে সিনাই পর্বতের নীচে পেঁছায়।

(খ) **মুক্তিদাতা মোজেস**—মোজেসের নেতৃত্বে ইহুদিরা যখন পথ পরিক্রমা করছিল তখন আকাশে মেঘের ঘনঘটা, বিদ্যুতের চমকানি আর বাজ পড়ার শব্দ। ঝড় ও বাজের দেবতাই ইহুদিদের দেবতা। ইহুদিদের বিশ্বাস তিনিই ঝড়-বৃষ্টির হাত থেকে গৃহহারা অসহায় ইহুদিদের রক্ষা করেন। বিদ্যুতের আলোয় অন্ধকার পথ আলোকিত করে তোলেন। মোজেসের নেতৃত্বে ইহুদিরা অন্তহীন পথ চলেও নিবৃত্ত হয় না।

সিনাই পেঁছে মোজেস ইহুদিদের ভগবান জিহোবার কাছ থেকে দশটি অমূল্য উপদেশ শোনেন। কথিত আছে, এগুলি দেবতা জিহোবা স্বয়ং ইহুদিদের ধর্মগুরু মোজেসকে বলেছিলেন। তাতে ইহুদিদের জীবনধারা কিভাবে উন্নত ও পবিত্র করে তোলা যায় তারই নির্দেশ আছে।

ইহুদিরা বলে, দেবতার বাণী একটি পাথরে খোদাই করা অবস্থায় ঝড়-বৃষ্টি থামার পরে দেখা গিয়েছিল।

(গ) **দাসত্ব থেকে মুক্তির পরবর্তী পর্যায়**—ইহুদিরা প্রথমে বারোটি উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। তাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত চলত সংঘর্ষ। প্রথম সল তাদের সংগঠিত করেন। পরে ডেভিড নামে একজন রণচতুর সাহসী ব্যক্তি সমগ্র প্যালেস্টাইনে তাঁর কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। তাঁর রাজধানী হয় জেরুসালেম। ডেভিড তাঁর বাহুবলে ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের কতকাংশ এবং সিরিয়া জয় করেন। এভাবে শুরু হয় ইহুদিদের সাম্রাজ্য বিজয়।

ডেভিডের মৃত্যুর পরে **সলোমন** জেরুসালেমের সিংহাসনে বসেন।

ন্যায়পরায়ণতা, উদারতা এবং রণচতুরতার জন্য তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর রাজত্বকালে ইহুদিদের সাম্রাজ্য গৌরবের চরম শিখরে উপনীত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য করে ইহুদিরা ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠে। জেরুসালেম নগরীকে সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ ও মন্দির দ্বারা সুসজ্জিত করে তোলা হয়। এভাবে মোজেসের নির্দেশিত পন্থায় এবং ডেভিড সলোমনের সুগঠিত নেতৃত্বে প্রাচীন ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে ইহুদিদের নব-অভ্যুত্থান ঘটে। সলোমনের মৃত্যুর পরে ইহুদিদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয়। অন্তর্কলহে তারা দুর্বল হয়। ব্যাবিলনের হাতে পরাজিত ইহুদিরা আবার ক্রীতদাসের ঘৃণ্য জীবনযাপনে বাধ্য হয়।

অনুশীলনী

[ক] বড় প্রশ্ন

১। ব্যাবিলনের সভ্যতার পরিচয় দাও।

২। 'হামুরাবির বিধান' বলতে কি বোঝ? হামুরাবির বিধানে উল্লিখিত সমাজ-চিত্র সম্পর্কে কি জান?

৩। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে কিভাবে প্রাচীন মিশরের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল।

৪। জরথুস্ট্র সম্পর্কে কি জান? তার ধর্মমতের পরিচয় দাও।

৫। মিশরের অধীনে ইহুদিদের জীবনধারা সম্পর্কে আলোচনা কর।

৬। দাসত্ব থেকে মুক্তির পরে ইহুদিদের জীবন কিভাবে কেটেছিল?

[খ] সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। কৃষি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাবিলনবাসীর কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

২। ব্যাবিলনের মন্দির ও পুরোহিতদের সম্পর্কে যা জান লেখ।

৩। ফ্যারাও তৃতীয় থোটমোস সম্পর্কে যা জান লেখ।

৪। কিভাবে পারস্যের উত্থান ঘটেছিল?

৫। মোজেসকে ইহুদিদের মুক্তিদাতা বলা হয় কেন?

৬। জিহোবার কাছ থেকে মোজেস কয়টি উপদেশ শোনেন?

[গ] বুদ্ধির প্রশ্ন

১। ভুল উক্তিগুলি শুদ্ধ করে লেখ:

(ক) ব্যাবিলনের প্রধান দেবতা ছিলেন আমন। (খ) হামুরাবির বিধানে (কোডে) ক্রীতদাসদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

১। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) ব্যাবিলনের সবচেয়ে সমৃদ্ধি ও বিকাশ দেখা দেয়—রাজত্বকালে। (খ) তৃতীয় — প্রথম জীবনে —দেবতার মন্দিরের একজন সামান্য পুরোহিত ছিলেন। (গ) ইরাণীদের ধর্মগ্রন্থ — সঙ্গে বেদের বহুদিক থেকে মিল আছে। ঘ) —নেতৃত্বে ইহুদিদের আগমনের কাহিনী বাইবেলের — সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে। (ঙ) ডেভিডের মৃত্যুর পর —তাঁর সিংহাসনে বসেন।

২। যথার্থ উত্তরটি খুঁজে (✓) চিহ্নিত করে দেখাও ঃ

প্রশ্ন	উত্তর
(ক) জিগ্‌গুরেট বলতে বোঝাত—	ইরাণীদের দেবতা / ব্যাবিলনের ধর্মমন্দির / ইহুদিদের ধর্মগুরু।
(খ) ব্যাবিলন নগরীর প্রধান দেবতা ছিলেন—	আন্নার / মারডুক / ঈশ্বতার।
(গ) জরথুষ্ট্রের মতবাদ যে গ্রন্থে সংকলিত তার নাম—	অবেস্তা / জরথুস্ত্র / বাইবেল।
(ঘ) পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্যের অন্যতম হল—	মারডুক / ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান / নিনেভের ভগ্নস্তূপ।
(ঙ) তৃতীয় থোটমোস ছিলেন—	ব্যাবিলনের রাজা / মিশরের ফ্যারাও / ইরাণীদের ধর্মগুরু।

[৩] মৌখিক প্রশ্ন

(ক) সূর্যঘড়ি কি? (খ) ব্যাবিলনের অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা কি ছিল? (গ) ব্যাবিলনের সূর্যের দেবতার নাম কি ছিল? (ঘ) হাম্মুরাবি কোথাকার রাজা ছিলেন? (ঙ) অবেস্তা জিন্দাবেস্তা কাদের ধর্মগ্রন্থ? (চ) আসীরিয়দের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন? (ছ) হিক্‌সস্‌ কি? (জ) প্রথম দরাইয়ুস কোথাকার রাজা ছিলেন? (ঝ) পার্শী কাদের বলে? (ঞ) এব্রাহামের বংশধর কাদের বলা হতো? (ট) জিহোবা কাদের দেবতা? (ঠ) ডেভিড কে ছিলেন? (ড) সলোমন কোথায় রাজত্ব করতেন? (ঢ) নিনেভ নগরী কাদের রাজধানী ছিল?

পঞ্চম অধ্যায়

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার জননী ঃ গ্রীস দেশ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সূচনা—পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ও সংস্কৃতির উৎস ও লীলাভূমি হল গ্রীস দেশ। পাহাড়-পর্বত ঘেরা এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে সুদূর অতীতে খুব উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। ইজিয়ান সাগরের উপকূলে এই দেশটিতে



ছিল অসংখ্য ছোট-বড় পাহাড়। এই গ্রীসেরা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। উত্তর দিক থেকে তারা একদিন এদেশে প্রবেশ করেছিল। এরা অ্যাকিয়ান, আইওনিয়ান এবং ডোরিয়ান—এই তিনটি প্রধান শাখায় বিভক্ত ছিল। পরে গ্রীসবাসীরা নিজেদের হেলেনস বা গ্রীস নামে অভিহিত করে।

১। ক্রীট সভ্যতার প্রভাব ঃ

আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ২১০০ অব্দে প্রাচীন ক্রীট দ্বীপে এক উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। ক্রীটের অধিবাসীরা সুন্দর সুন্দর প্রাসাদে বাস করত। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে এই স্থানের নোসস নামে নগরীর

ভগ্নস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। তাতে দেখা যায়, ক্রীটবাসী সুদৃশ্য মৃৎপাত্র ও সুন্দর অলংকার ব্যবহার করত। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের দিক থেকে তারা খুবই উন্নত ছিল। এদেশের অধিবাসীরা নৌ-বাণিজ্যের দ্বারা বিত্তশালী হয়ে উঠেছিল। বারবার বহিঃশত্রুর আক্রমণে এই নগরীর সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটে। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ষোড়শ শতকে গ্রীসবাসী অভিযান চালিয়ে এই নগরকে বিধ্বস্ত করে দেয়। পরে এই ক্রীট দ্বীপের সভ্যতার দ্বারা গ্রীসেরা নূতন সভ্যতা সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিল। সেজন্য গ্রীস সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ক্রীট সভ্যতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

(ক) **হোমারের যুগে গ্রীস**—গ্রীসের আদি পর্বের ইতিহাস জানা যায় **ইলিয়াড** এবং **ওডিসি** নামে দুটি মহাকাব্য থেকে। এই মহাকাব্য দুটির রচয়িতা ছিলেন হোমার নামে একজন কবি। তাঁর মহাকাব্য দুটির রচনাকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। একটি মত মহাকাব্য দুটি খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে রচিত। অন্য মতটি খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দী থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে অথবা আরও কিছু পরে রচিত।



হোমার

ইলিয়াড মহাকাব্যে ট্রয় নগরীর অবরোধ ও ধ্বংসের কাহিনী সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে। ওডিসি মহাকাব্যে অডিসিউস বা ইউলিসিস নামে একজন গ্রীকবীরের ট্রয় নগরী থেকে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে দশ বছরের সমুদ্রযাত্রার কাহিনীর এক আনুপূর্বিক ইতিহাস সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই মহাকাব্যটিতে গ্রীকদের আদি পর্যায়ের বীরত্ব ও সাহসিকতার

কাহিনী গুরুত্ব লাভ করেছে। সেজন্য এ যুগকে **বীরযুগ** আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, মহাকবি হোমারের মহাকাব্য রচনার কাল অর্থে এই যুগকে বলা হয় **হোমারের যুগ**। হোমার সম্ভবতঃ সেই যুগের বীরদের কীর্তিগাথা শোনাবার জন্যই এই দুটি মহাকাব্য লেখা শুরু করেন। পরবর্তী কালে বিভিন্ন কবির হাতে 'ইলিয়াড' এবং 'ওডিসি'-র কাহিনী আরও বিকশিত রূপ লাভ করে। এই দুটি মহাকাব্য থেকে তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়।

ইলিয়াড ঃ এই মহাকাব্যে ট্রয় নগর অবরোধ ও তার ধ্বংসের কাহিনী সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। ট্রয়ের রাজা স্পার্টায় বেড়াতে যান। সেখানকার সুন্দরী রাণী হেলেনার রূপে তিনি মুগ্ধ হন। তাঁকে তিনি নিজ রাজ্যে অপহরণ করে আনেন। স্পার্টা ছিল আকিয়ান লীগ নামে একদল রাষ্ট্রের নেতা। আকিয়ানেরা ট্রয় আক্রমণ করে। অনেকদিন ধরে ট্রয় আর স্পার্টায় যুদ্ধ চলে। শেষ পর্যন্ত ট্রয়ের পতনের মধ্য দিয়ে এই কাহিনী শেষ হয়।

ওডিসি ঃ এই মহাকাব্যে ইথাকার রাজা ওডিসিউসের ট্রয়ের যুদ্ধের পরে অশেষ দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের মধ্য দিয়ে স্বদেশে ফিরে আসার কাহিনী বলা হয়েছে। ওডিসিউস দীর্ঘ দশ বছর সমুদ্রে ঘুরে বেড়ান। এর ফলে তিনি অনেক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তারপর তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন। ওডিসিউসের দীর্ঘ দশ বছরের সমুদ্র যাত্রার কাহিনীর আনুপূর্বিক বিবরণ ওডিসিতে সুন্দরভাবে লেখা আছে।

মহাকবি হোমারের ইলিয়াড এবং ওডিসিতে বীর রাজাদের যুদ্ধের কাহিনী বলা হয়েছে। গ্রীকদের আদি পর্যায়ের শৌর্য-বীর্য-পরাক্রমের কাহিনীই মহাকাব্যগুলির কাহিনী। সেজন্য ইলিয়াড-ওডিসি রচনাকালীন সময়কালকে গ্রীসদেশের ইতিহাসে বলা হয় **বীরযুগ**।

মহাকবি হোমার ইলিয়াড-ওডিসির রচয়িতা। বীরযুগে ঘটে যাওয়া ঘটনার তিনি ছিলেন নীরব সাক্ষী। হোমারের আবির্ভাব কাল এই কারণে গ্রীসের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। হোমারের আবির্ভাবকালীন সময় অর্থে এ যুগ তাই **হোমারের যুগ**।

হোমার বীরযুগের কীর্তিগাথা শোনাবার জন্যই বোধ হয় ইলিয়াড-ওডিসি রচনা করেছিলেন। হয়ত বা তিনি সবার আগে এ কাব্য রচনার সূচনা করেন। পরে বিভিন্ন কবি ইলিয়াড-ওডিসির কাহিনীতে আরও উপভোগ্য এবং

চমকপ্রদ ঘটনাবলী সংযোজনা করেন। তাতে ইলিয়াড-ওডিসির কাহিনী আরও বিকশিত রূপ লাভ করে। এই দুটি মহাকাব্য পড়ে আমরা বীরযুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনধারা সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারি।

(খ) নগর-রাষ্ট্র—গ্রীকেরা প্রথমে ছিল যাযাবর। ছোট ছোট গ্রামে দল বেঁধে সবাই মিলে থাকত। ওদের বাসস্থান ছিল এক একটি কুটির। পরে গ্রীকেরা গ্রামগুলিকে বিকশিত করে তোলে। সেগুলি নগরের আকার নেয়। কালক্রমে এই নগরই নগর-রাষ্ট্র পরিণত হয়। এসব নগর-রাষ্ট্রের মধ্যে করিন্থ, থিবস, স্পার্টা, এথেন্স অন্যতম।

হোমারের যুগে এসব ছোট নগর-রাষ্ট্রের রাজারা প্রতিবেশী রাজ্যের রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে মেতে থাকতেন। অতি তুচ্ছ ঘটনা নিয়েও মহাসমর শুরু হয়ে যেত। তখন সে সব নগর-রাষ্ট্রের রাজাই ছিলেন সর্বেসর্বা। যুদ্ধ শুরু হলে রাজারাই সৈন্যবাহিনীকে পরিচালনা করতেন। প্রচুর ক্ষমতা হাতে থাকা সত্ত্বেও রাজারা তখন কিন্তু স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। কারণ নগর-রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান লোকদের নিয়ে তখন একটি সভা গঠিত হতো; জনসাধারণকে নিয়ে গঠিত হতো একটি সমিতি। এই সভা ও সমিতির বুদ্ধি-পরামর্শ নিয়ে রাজা চলতেন। পরবর্তীকালে ক্ষমতা ও সম্পদ হাতে পেয়ে রাজারা এক সময়ে স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠেন। তাতে করে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। রাজারা ক্ষমতাচ্যুত হন এবং ধীরে ধীরে রাজপদ লোপ পায়।

হোমারের যুগে গ্রীসবাসীদের জীবনযাত্রা প্রণালী ছিল সহজ ও সরল। প্রথম দিকে রাজায় প্রজায় সম্পর্ক খুব ভাল ছিল। তখন প্রধান জীবিকা ছিল চাষবাস ও পশুপালন।

গ্রীকেরা তখন বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস করত। দেবতাদের রাজা ছিলেন জিউস। জ্ঞান ও বুদ্ধির দেবী ছিলেন আথিনা। আর আপেলো ছিলেন সূর্যের দেবতা।

(গ) সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময় ও উপনিবেশ স্থাপন: সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়—গ্রীকেরা ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় আর্য ভাষাগোষ্ঠীর একটি শাখা। আর্য ভাষা তাদের হাতে নূতন রূপ লাভ করে হয় গ্রীক ভাষা। ইজিয়ান উপকূলে আর্যদের যে শাখা এসে বসতি গড়ে তুলেছিল তারা সকলেই এই গ্রীক ভাষাতেই কথা বলত। তাই গ্রীসদেশের বাসিন্দা ও

গ্রীক ভাষাভাষী অর্থে তারা হলো গ্রীক। গ্রীকেরা মনে করত তাদের সকলের পূর্বপুরুষ এক ও অভিন্ন। তারা হলো হেলেনের সন্তান। সে অর্থে গ্রীকেরা হল হেলেনিজ। নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও মৈত্রীর সম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা তারা উপলব্ধি করত। সেযুগে তাই এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের সাংস্কৃতিক ভাব-বিনিময় চলত। গ্রীকেরা হোমারের ইলিয়াড-ওডিসিকে জাতীয় মহাকাব্য মনে করত। তাই মহাকাব্যের বীরদের শৌর্য-বীর্য-পরাক্রমের কাহিনী পাঠ করে তারা আনন্দ ও বৈচিত্র্য লাভ করত।


গ্রীক-দেবতা

গ্রীকদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অভিন্ন হৃদয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে অলিম্পিক নামে ক্রীড়ানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। গ্রীসের অলিম্পিয়া পাহাড়ের কাছে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর একটি ক্রীড়ানুষ্ঠান হতো। অলিম্পিয়া পাহাড় অতি পবিত্র স্থান; দেবতাদের বাসভূমি। অলিম্পিক ক্রীড়ায় গ্রীসদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিযোগীরা অংশ নিত। প্রতিযোগীদের থাকা-খাওয়া ও নিরাপদে স্বদেশে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এই প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে গ্রীসের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক ভাব- বিনিময় চলত।

উপনিবেশ স্থাপন : ইজিয়ান সাগরতটের বাসিন্দা গ্রীকেরা ছিল সুদক্ষ নাবিক। নৌ-বাণিজ্যে তাঁদের দক্ষতা ছিল। তারা নৌকায় করে জলপথে অন্যদেশে পাড়ি দিত। ইজিয়ান উপকূলের ছোটখাট দুর্বল রাজ্য জয় করে গড়ে তুলত নূতন নূতন উপনিবেশ। সেখানকার সঙ্গে চলত

বাণিজ্যিক লেন-দেন। কখনও-বা সমুদ্র পার হয়ে নানান সুযোগ-সুবিধার লোভে গ্রীকেরা সদ্য জয় করা দেশগুলিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে দিত। গড়ে তুলত স্বদেশের বাইরে নূতন নূতন রাজ্য। সমুদ্র-সাহচর্য গ্রীকদের উপনিবেশ স্থাপনে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। এর ফলে গ্রীকেরা ব্যবসা-বাণিজ্যে পারদর্শী হয়। আর গ্রীসদেশের বাইরে গ্রীক সভ্যতার ব্যাপক প্রসার ঘটে।

২। এথেন্স ও স্পার্টা:

সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন: ভাষা ও রক্তের সম্পর্ক সূত্রে গ্রীকেরা এক জাতি, এক প্রাণ ও একতার আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল। চারদিকে পাহাড়, পর্বতের সারি—মাঝে ছোট ছোট নগর-রাজ্য। এরূপ শতধা বিভক্ত প্রাকৃতিক ব্যবধানের জন্য একই গ্রীসদেশে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য। এগুলোতে ছিল ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনধারা। সেকালে এথেন্স, স্পার্টা, করিন্থ, থেবস, ম্যাসিডন প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য নগর-রাজ্য। কোথাও রাজা দেশ শাসন করতেন, আবার কোথাও বা অভিজাতেরা দেশ চালাতেন। এসব নগর রাজ্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল এথেন্স ও স্পার্টা। সমস্ত গ্রীসের যা কিছু মৌলিকত্ব, চিন্তা-চেতনার বৈচিত্র ও স্বাতন্ত্র্য তার সবকিছুই এথেন্স ও ও স্পার্টার অধিবাসীদের জীবনধারায় প্রতিফলিত হয়েছিল। একজন পণ্ডিত ব্যক্তি এ দুটি নগর-রাজ্যকে বলেছেন গ্রীসদেশের যেন দুটি চোখ। সত্যই প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাসে এ দুটি নগর-রাজ্যের ভূমিকা চোখের মতই গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র গ্রীসদেশের ইতিহাস এ দুটির প্রভাবে প্রভাবিত। সেজন্যই এ দুটি নগর-রাজ্য সম্পর্কে আমরা বিশেষভাবে জানার চেষ্টা করব।

(ক) **এথেন্স: সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন:** সামাজিক দিক থেকে এথেন্সের প্রতিটি নাগরিক ছিল বিশেষ মর্যাদাবান ব্যক্তি। শৈশব থেকে ছাত্রদের নানা বিষয়ে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল। এথেন্সের শিক্ষা-দীক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল দেশের প্রতিটি ভাবী নাগরিককে বহুমুখী দিক থেকে যোগ্যতা ও গুণের অধিকারী করে তোলা। শিক্ষার বিষয়বস্তু ছিল শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস আরও কত কি!

দেশের প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক মধুর ছিল।

মেলামেশার মধ্যে কোনরকম বিভেদ বা তারতম্য ছিল না। হাটে-মাঠে সর্বত্রই প্রত্যেকে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা করত। সফিস্ট নামে একদল দার্শনিক ছাত্রদের কৌতূহল ও ধারণা-শক্তি বাড়িয়ে তোলার জন্য উন্নত প্রণালীতে শিক্ষা দিতেন। ষোল বছর বয়স হলে ছেলেরা ব্যায়াম, কুস্তি খেলাধুলার ওপর গুরুত্ব দিত। আঠার বছর বয়সে শেখান হতো রণকৌশল ও পৌরশাসন। মেয়েরা গৃহকর্ম, শেলাই ও গান-বাজনা শিখত। এথেন্স-বাসী আমোদ-প্রমোদ করতে ভালবাসত। এথেনা দেবীর মন্দিরে উৎসব হতো—সেখানে পালাগান চলত। কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, দৌড়ঝাঁপ, খেলাধুলো সবকিছুরই সেখানে প্রচলন ছিল।

এথেন্স ছিল প্রজাতন্ত্র। সেখানে প্রজারাই নগর শাসন করত। তেইশ বছর বয়সের পরে সকলেই নাগরিক বলে বিবেচিত হতো। সেখানে দেশ শাসনের রূপ ছিল গণতান্ত্রিক। অর্থাৎ জনসাধারণের স্বার্থে জনসাধারণ কর্তৃক শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হতো। সেখানে কোন রাজা ছিল না। প্রত্যেক নাগরিকের ছিল সমান অধিকার, সমান দায়িত্ব। তারাই নগর শাসন করত। এথেনা দেবীর মন্দিরে সকলে মিলিত হয়ে আইন পাস করত। দেশের অভিজাত বয়স্ক ব্যক্তিদের নিয়ে তৈরী হয়েছিল একটি জন-পরিষদ। এই জন-পরিষদের সদস্যদের সরাসরি ভাবে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করা হতো। সেখানে দাস, স্ত্রীলোক এবং বিদেশীদের কোন নাগরিক অধিকার ছিল না।

(খ) **স্পার্টা :** স্পার্টার সামাজিক জীবন ছিল কঠোর নিয়মশৃঙ্খলে গড়া। সেখানে আমোদ-প্রমোদ স্ফূর্তির নামগন্ধ ছিল না। খ্রীস্টপূর্ব নবম শতকে এখানকার পূর্বেকার বাসিন্দাদের পরাজিত করে স্পার্টানরা ক্রীতদাসে পরিণত করে রাখে। সংখ্যায় এই দাসেরা ছিল খুব বেশি। তাদের দাবিয়ে রাখার জন্য স্পার্টার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন ছিল কঠোর শৃঙ্খলে বাঁধা। এখানে স্বাস্থ্যবান ছেলেদের বাপমা'র কাছ থেকে নিয়ে গিয়ে সামরিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত করা হতো। যাতে দেহ ও মনের শক্তি বাড়ে তাদের সে শিক্ষাদানই ছিল প্রধান লক্ষ্য। সেজন্য তারা প্রথম শিখত হুকুম তামিল করতে, এরপর হুকুম দিতে এবং সবশেষে নেতৃত্ব দিতে। এখানে সরকার নিযুক্ত দাসেরা জমিজমা চাষবাস করত। জমির আয় থেকেই তাদের খরচ চলত। তাদের হাতে কোন টাকা-পয়সা দেওয়া হতো না। বিদেশীদের সঙ্গে দেখাশুনা করার অধিকারও তাদের ছিল না।

এভাবে কঠোর সামরিক শৃংখলায় আবদ্ধ থেকে স্পার্টানরা যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই জানত না। যুদ্ধ চলুক আর না চলুক সৈনিক জীবন ছাড়া তারা আর কিছুই বুঝত না। স্পার্টান মেয়েরা যাতে সুস্থ সবল সন্তানের জননী হয়ে উঠতে পারে সেজন্য তাদের ব্যায়াম শিখতে হতো। ছেলেদের সঙ্গে তারা পাল্লা দিয়ে দৌড়ঝাঁপ দিত। সেখানকার সামাজিক জীবনে আমোদ-প্রমোদের কোন স্থান ছিল না। এমনকি প্রাণ-মন খুলে পারস্পরিক কথা-বার্তা বলবার মত অধিকারও তাদের ছিল না।

লাইকারগাস নামে একজন আইনজ্ঞ স্পার্টার শাসনতন্ত্র রচনা করেন। সেখানকার সামরিক আইন-কানুন ছিল খুবই কঠোর। স্পার্টায় কোন নাগরিক অধিকার ছিল না। দাসদের ওপর নির্যাতন চলত ও তাদের বেগার খাটান হতো। সামরিক শাসনকর্তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর দেশবাসীর ভাগ্য নির্ভর করত। সামান্যতম অপরাধীকেও লঘু পাপে গুরুদণ্ড দানের বিধান ছিল। ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মূল্য ছিল না। সামরিক শাসনকর্তার নির্দেশই হতো আইন এবং সেটা সকলেই অবনত মস্তকে মেনে নিত।

(গ) **এথেন্স ও স্পার্টার অবদান**—গ্রীক জাতি মানব সভ্যতার ভাণ্ডারে যে অমূল্য অবদান রেখে গেছে তার মূলে এথেন্সবাসীর ভূমিকা সর্বাধিক। পারসিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এই এথেন্সবাসীর পরাক্রমের জন্যই হেলেনিসদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, দর্শন সাহিত্য—সব কিছুতেই এথেন্সবাসী আজও অপরাজেয় মহিমায় আসীন। রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের উদ্ভব একদিন এদেশেই হয়েছিল। আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শাসন ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক। এই বৈশিষ্ট্যই এথেন্সের সভ্যতাকে কালজয়ী করেছে।

স্পার্টার নাগরিকরা এক সময়ে স্বাস্থ্যে, নিয়মানুগত্যে ও সামরিক শক্তিতে সকলকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। স্থলযুদ্ধে তাদের শক্তি ছিল অসাধারণ। দক্ষিণ গ্রীসের বহু নগর-রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় স্পার্টার অধীনতা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। দাসেরা সামরিক প্রভু—অভিজাত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মাথা তুলবার মত স্পর্ধা দেখায় নি। কিন্তু সাময়িক প্রভাব-প্রতিপত্তির মানদণ্ডে সমগ্র মানব সভ্যতার মূলে একটি জাতির অবদানের পরিমাপ করা চলে না। সেদিক থেকে বিচার করলে বলা চলে মানব সভ্যতার সমৃদ্ধি ও বিকাশে স্পার্টার দান কিছুই নেই। যে সামরিক শক্তির

জন্য স্পার্টা বড়াই করত একদিন তাও নির্মূল হয়ে যায়। এথেন্সের বহুমুখী বিকাশ এবং পরবর্তীকালে ম্যাসিডনের উত্থানে স্পার্টার সামরিক দম্ভ বিলীন হয়ে কালের অতলে তলিয়ে যায়।

৩। এথেন্সের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি :

এথেন্স হল গণতন্ত্রের পীঠস্থান। খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতকে এথেন্সের ইতিহাসে একজন প্রতিভাধর রাষ্ট্রনায়কের আবির্ভাব হয়। সেলামিসের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এথেন্সের যে অজেয় শক্তির প্রকাশ ঘটেছিল—পেরিক্লিস নামে রাষ্ট্রনায়কের সুদক্ষ নেতৃত্ব, অতুলনীয় রণকৌশল এবং অসামান্য সংগঠন শক্তির প্রভাবে সেই শক্তি আরও বিকশিত হয়ে ওঠে। এথেন্সের নৌ-শক্তি বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহুমুখী বিকাশ দেখা দেয়। এথেন্সের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি আরও দৃঢ় মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। পেরিক্লিসের মতো রাষ্ট্রনায়কের সুগঠিত নেতৃত্ব, **সক্রেটিসের** মত দার্শনিক, থুসিডিডিস ও হেরোডেটাসের মত ঐতিহাসিক, ঈসকাইলাসের মত নাট্যকারের আবির্ভাব এ যুগে ঘটে। এইভাবেই এথেন্সের ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগের সূচনা হয়।



সক্রেটিস

(ক) **সক্রেটিস**—এযুগের সেরা পণ্ডিত ও দার্শনিক ছিলেন সক্রেটিস। সাধারণ ভাস্করের ঘরে তিনি জন্মেছিলেন। সক্রেটিস নিজের আন্তরিক চেষ্টায় সে যুগের একজন সেরা দার্শনিক হয়ে ওঠেন। তাঁর উপদেশ ছিল সহজ সরল। বক্তব্য ছিল প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য। সেজন্য সেই যুগের বহু তরুণ তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে। সক্রেটিস ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং তার সর্বাঙ্গীন বিকাশের পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি বলতেন

—রাষ্ট্র থেকে ব্যক্তি বড়, কারণ ব্যক্তির জন্যই প্রয়োজন রাষ্ট্রের। ব্যক্তিকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে তিনি ধর্মকেও ছোট করতে দ্বিধা করেন নি। সেজন্যই ধর্মবিরোধিতার অভিযোগ এনে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়। বিচারে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় সক্রেটিসকে বিষপানে মৃত্যুবরণ করতে হয়। পরবর্তী-কালে সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো এবং প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল তাঁর মতাদর্শের প্রচারে উদ্যোগী হন।



পেরিক্লিস

(খ) পেরিক্লিস : ইনি ছিলেন একজন সুবক্তা ও স্বদেশপ্রেমিক। তাঁর নেতৃত্ব ও উৎসাহে এথেন্সের বিভিন্ন প্রতিভাধরেরা নিজ নিজ প্রতিভার বিকাশ সাধনে উৎসাহিত হন। পেরিক্লিস পূর্বের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে সুনিয়ন্ত্রিত করে এথেন্সকে শীঘ্রই আদর্শ নগর-রাষ্ট্রে পরিণত করেন। তাঁর বক্তৃতায় সকলে মুগ্ধ হতো। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। তাঁর চেষ্টায় এথেন্সের অ্যাক্রোপোলিস নামক স্থানে পার্থেনন নামে একটি মন্দির এবং অনেক সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল।

(গ) ঈসকাইলাস ও সফোক্লিস—এই সময়ে সাহিত্যের ক্ষেত্রে কাব্য ও নাটক রচনায় উৎসাহ দেওয়া হতো। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পুরস্কার পেতেন। ডায়নোসিউসের মন্দিরে ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে নাটকাভিনয় হতো। এযুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন ঈসকাইলাস। তিনি বহুবার সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পুরস্কার পান। তাঁকে বলা হয় ট্র্যাজেডি বা বিয়োগান্ত নাটকের জন্মদাতা। এ যুগের আর একজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হলেন সফোক্লিস তিনি অনেক নাটক রচনা করে গ্রীক নাট্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলেন।

তাঁর নাটকের ভাব ও ভাষা ছিল খুবই সুন্দর। তিনি ট্র্যাজেডি নাটক রচনায় সবচেয়ে বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এ কালের আর একজন বিখ্যাত নাট্যকার হলেন ইউরিপিডিস্‌। এভাবে গ্রীক নাট্য-সাহিত্য সেই সময়ে বহু প্রতিভাধর নাট্যকারের অবদানে সমৃদ্ধ ও উন্নত হয়ে ওঠে। কাব্যের ক্ষেত্রে গীতি-কবিতা তখন খুবই জনপ্রিয় ছিল। স্যাফো ও পিণ্ডার ছিলেন সেই যুগের দুজন শ্রেষ্ঠ কবি।

(ঘ) **হেরোডেটাস ও থুসিডিডিজ**—এই যুগে হেরোডেটাস ও থুসিডিডিজ নামে দু'জন বিখ্যাত ঐতিহাসিকের আবির্ভাব হয়। হেরোডেটাসকে বলা হয় ইতিহাসের জনক। কারণ তিনিই সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত ও অভিজ্ঞতা ভিত্তিক ইতিহাস রচনা করেন। তিনি গ্রীকদের পারস্য অভিযানের মনোজ্ঞ বিবরণী দেন। থুসিডিডিজ এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যকার সংঘর্ষের বিবরণী রচনা করেন। এথেন্সের ঐতিহাসিকদের ইতিহাস নিষ্ঠা পরবর্তীকালে ট্যাসিটাসের মত রোমান ঐতিহাসিককেও প্রভাবিত করেছিল।

(ঙ) **ধর্ম, শিল্প ও স্থাপত্য** : পূর্বেই বলা হয়েছে, এথেন্সবাসী ডায়নোসিউস নামে মন্দিরে উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে নাটকাভিনয় করতেন। এথেন্স নগরীর দেবতা ছিলেন এথেনা। এই সময়ে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিকাশ ঘটে। বহু সুন্দর সুন্দর মন্দির ও প্রাসাদ নির্মিত হয়। মন্দিরগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো পেরিক্লিসের সময়ে অ্যাক্রোপোলিসের ওপরে নির্মিত **পার্থেনন** মন্দির। এটি এথেন্সের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আথিনার মন্দির। এখানে আথিনা দেবীর সোনার ও হাতীর দাঁতের উৎকৃষ্ট মূর্তি ছিল। এ যুগে নির্মিত পাথরের মূর্তিগুলিও উল্লেখযোগ্য। সুপ্রসিদ্ধ ভাস্কর প্রাক্সিটালিজ পাথরের মূর্তিতে যেরূপ সৌন্দর্য ও কমনীয়তা ফুটিয়ে তুলতেন সেরূপ আর কেউ পারত না।

৪। ম্যাসিডনের অভ্যুদয় :

গ্রীসের ইতিহাসে একদিন কালের নিয়মে স্পার্টা ও এথেন্সের সামরিক শক্তি ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে আসে। তখন অভ্যুদয় হয় ম্যাসিডন নামে নূতন এক নগর-রাষ্ট্রের। এক সময়ে এথেন্স ও স্পার্টা সমগ্র গ্রীসে প্রভুত্ব স্থাপনের নিমিত্ত পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারই সুযোগ গ্রহণ করেন ম্যাসিডন-রাজ ফিলিপ। তিনি একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করেন।

তাঁর অভিপ্রায় ছিল সমগ্র গ্রীসে ম্যাসিডনের আধিপত্য স্থাপন করা এবং ঐক্যবদ্ধ গ্রীক বাহিনী নিয়ে পারসিকদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। তাঁর সে সংকল্প সার্থক করে তোলার আগেই তিনি আততায়ীর হাতে প্রাণ হারান। ফিলিপের মৃত্যুর পরে তাঁর সুযোগ্য বীরপুত্র আলেকজাণ্ডার ম্যাসিডনের সিংহাসনে বসেন।

(ক) **আলেকজাণ্ডার ও তাঁর বিজয় অভিযান**—আলেকজাণ্ডার মাত্র উনিশ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন। তিনি তাঁর পিতার মতই উচ্চাভিলাষী ছিলেন। সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হওয়াই ছিল তাঁর প্রধান সংকল্প। তাঁর গুরু ছিলেন সেই যুগের প্রসিদ্ধ মনীষী অ্যারিস্টটল। তিনি গুরুর শিক্ষায় গ্রীক সভ্যতার যা কিছু মহান ও সুন্দর তার সমস্তই আয়ত্ত করেছিলেন।

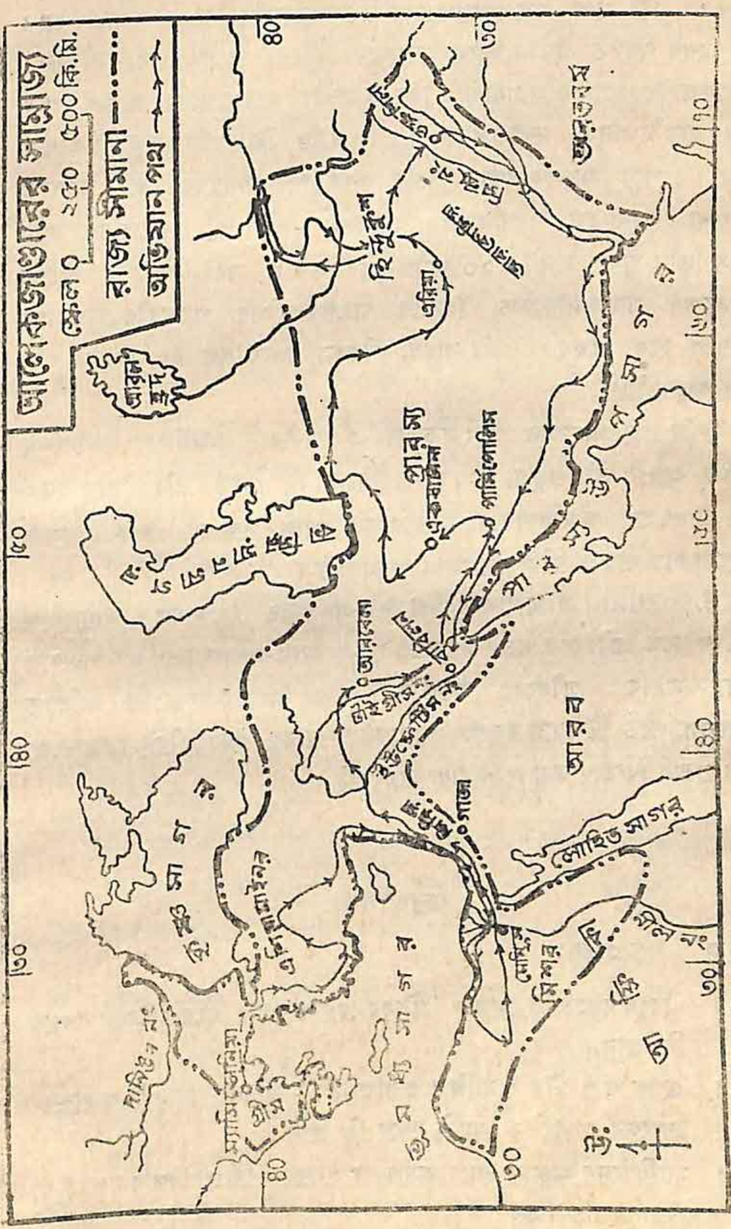
প্রথমে আলেকজাণ্ডার সমগ্র গ্রীসদেশে তাঁর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হন। প্রথমে তিনি গ্র্যানিকাস নদীর তীরে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর পারসিক বাহিনীকে পরাজিত করেন। এরপর একে একে ব্যাবিলন, মিশর, দামাস্কাস, সিডন, টায়ার প্রভৃতি দেশ জয়ের পরে আফগানিস্থানের মধ্য দিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ভারতে পৌঁছান। ভারতবর্ষে তখন অনেকগুলি খণ্ড ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। সেগুলির পরস্পরের মধ্যে মিল ছিল না। তখন ভারতে একটি উল্লেখযোগ্য নগরী ছিল তক্ষশিলা। সেখানকার



আলেকজাণ্ডার

রাজা ছিলেন অম্ভি। তিনি ছিলেন দুর্বলচিত্ত। তাই বিনা যুদ্ধে আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করেন। তিনি আলেকজাণ্ডারকে পুরুর

বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করেছিলেন। কারণ পুরুর সঙ্গে তাঁর শত্রুতা ছিল।



(খ) আলেকজাণ্ডার ও পুরুর সংঘর্ষ—ঝিলাম ও চিনাব নদীর

সঙ্গমস্থলে এক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা ছিলেন পুরু। তাঁর ছিল বিরাট সুগঠিত সৈন্যদল। তিনি মহাবীর আলেকজাণ্ডারের বিজয় অভিযানের গতি রোধ করেন। তাঁর সঙ্গে আলেকজাণ্ডারের সৈন্যবাহিনীর প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি আলেকজাণ্ডারের নিকট পরাজিত ও বন্দী হন। আলেকজাণ্ডার পুরুর অসামান্য বীরত্ব ও গভীর স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাই তিনি পুরুকে মুক্তি দিয়ে তাঁর রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। পরে আলেকজাণ্ডার তাঁর রণক্লান্ত সৈন্যদের নিয়ে স্বদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথিমধ্যে ব্যাবিলন নগরীতে মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে তিনি মারা যান (৩২৩ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দ)। সর্বকালের সর্ব যুগের অপরাজেয় সাম্রাজ্য-বিজেতা হিসাবে আলেকজাণ্ডার পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর সাহস, বীরত্ব, রণকৌশল এবং সংগঠন শক্তি ছিল অতুলনীয়।

তিনি তাঁর বাহুবলে এবং দৃঢ়তায় এসিয়া-ইউরোপ-আফ্রিকা মহাদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে তাঁর প্রভুত্ব স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে এই বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় ও গ্রীক সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

(গ) রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান—নবজাগ্রত রোমান সাম্রাজ্যের উত্থানের ফলে গ্রীকদের পতন দ্রুততর হয়। আলেকজাণ্ডারের মত পরাক্রান্ত রাজার অভাব; গ্রীকদের অন্তর্কলহ এবং আলেকজাণ্ডারের অধিকৃত সাম্রাজ্যগুলিতে উপযুক্ত রণদক্ষ শাসকের অভাবের জন্য শীঘ্রই রোমানদের পক্ষে প্রভাব বিস্তার করা সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।

অনুশীলনী

[ক] বড় প্রশ্ন :

১। বীরযুগ বলতে কি বোঝ। গ্রীসের সেই সময়কার নগর-রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে কি জান?

২। এথেন্স ও স্পার্টার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনধারার পরিচয় দাও?

৩। এথেন্সের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি সম্বন্ধে কি জান?

৪। ম্যাসিডনের অভ্যুদয় এবং আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে যা জান আলোচনা কর।

[খ] ছোট প্রশ্ন :

১। গ্রীক সভ্যতার বিকাশে ক্রীট সভ্যতার প্রভাব সম্পর্কে কি জান ?

২। হোমার কে ছিলেন ? তাঁর সম্পর্কে কি জান ?

৩। সক্রেটিস কে ছিলেন ? তিনি কি জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন ?

৪। পেরিক্লিস কে ? তাঁর সম্পর্কে যা জান লেখ।

৫। পেরিক্লিসের যুগের ধর্ম ও সাহিত্যের বিকাশ সম্পর্কে কি জান ?

[গ] বুদ্ধির প্রশ্ন :

১। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) পাশ্চাত্য — ও সংস্কৃতির উৎস হল — । (খ) গ্রীসের — ইতিহাস জানা যায় — ও — নামে দুটি মহাকাব্য থেকে। (গ) — যুগে — বহু ছোটখাট নগর-রাষ্ট্র ছিল। (ঘ) এথেন্সে ছিল — । সেখানে প্রজারাই — শাসন করত। (ঙ) — নামে একজন আইনজ্ঞ স্পার্টার শাসনতন্ত্র রচনা করেন। (চ) পেরিক্লিস ছিলেন একজন —ও — । (ছ) — ও চিনাব নদীর সঙ্গমস্থলে এক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা ছিলেন— ।

২। ভুল উক্তিগুলিকে শুদ্ধ করে লেখ ঃ

(ক) লাইকারগাস ছিলেন এথেন্সের একজন রাষ্ট্রনায়ক। (খ) পেরিক্লিসের আবির্ভাবের সময়কালকে গ্রীসের ইতিহাসে বলা হয় বীরযুগ। (গ) হেরোডেটাস ছিলেন এথেন্সের স্বর্ণযুগের একজন প্রসিদ্ধ ভাস্কর। (ঘ) আলেকজাণ্ডারের শিক্ষাগুরু ছিলেন সক্রেটিস। (চ) উজ্জয়িনীর রাজা পুরু বিনা যুদ্ধে আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করেন।

৩। যথার্থ উত্তরটি খুঁজে (✓) চিহ্নিত কর ঃ

প্রশ্ন	উত্তর
(ক) হোমার ছিলেন গ্রীসের একজন বিখ্যাত—	দার্শনিক / কবি / শিল্পী
(খ) গ্রীসের স্বর্ণযুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন —	হেরোডেটাস / প্লেটো / ঈসকাইলাস

(গ) ইতিহাসের জনক বলা হয়—	অ্যারিস্টটলকে / সফিক্লিসকে / হেরোডেটাসকে
(ঘ) গণতন্ত্রের পীঠস্থান হল—	স্পার্টা / ম্যাসিডন / এথেন্স
(ঙ) স্পার্টায় যে শাসন-ব্যবস্থা ছিল তা হল—	সামরিক একনায়কতন্ত্র / গণতন্ত্র / প্রজাতন্ত্র

[ঘ] মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) হোমার কে ছিলেন ? (খ) গ্রীসের ইতিহাসে কোন্ যুগকে বীরযুগ বলে ? (গ) সফিস্টরা কি করত ? (ঘ) লাইকারগাস কে ছিলেন ? (ঙ) আলেকজাণ্ডারের গুরু কে ছিলেন ? (চ) পার্থেনন কি ? (ছ) প্রাকসিটালিজ কে ছিলেন ? (জ) ফিলিপ কোথাকার রাজা ছিলেন ; (ঝ) অস্তি কোথাকার রাজা ছিলেন ? (ঞ) আলেকজাণ্ডারের কোথায় মৃত্যু হয় ? (ট) হেলেনিস শব্দটির অর্থ কি ?

———

চতুর্থ অধ্যায়

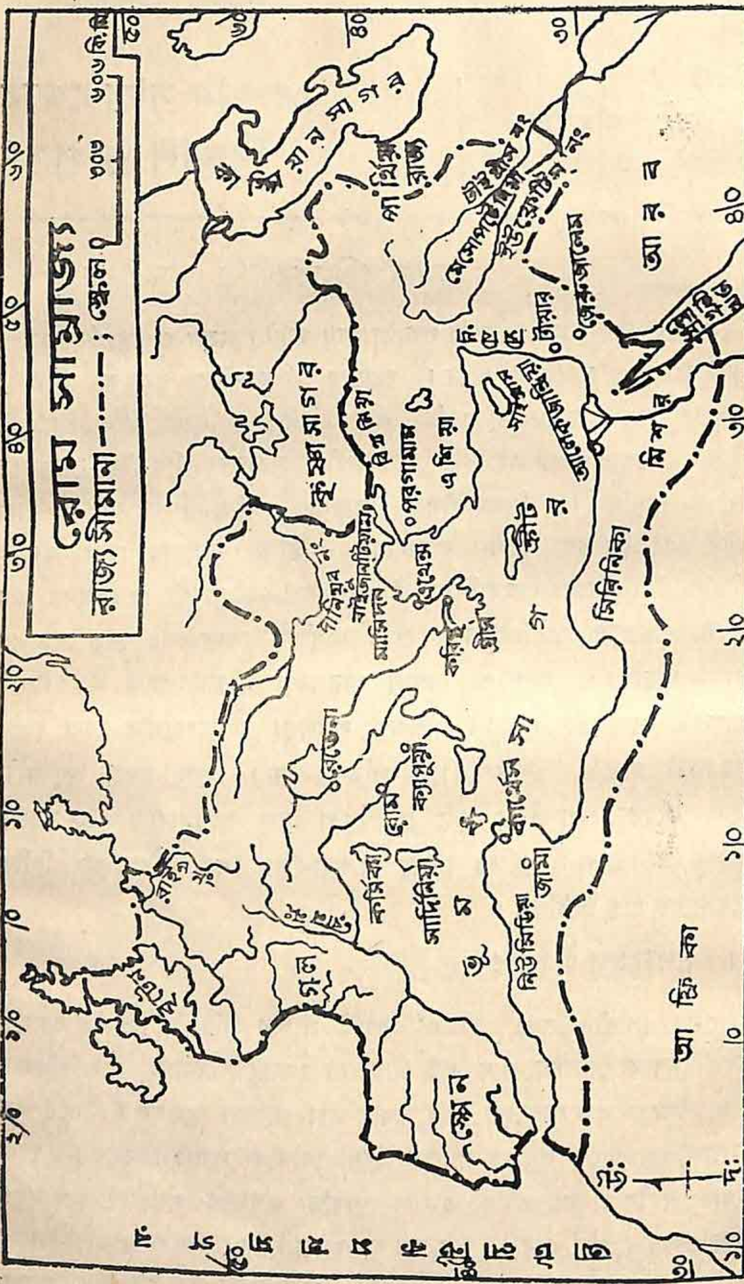
রোমান সাম্রাজ্যের বিকাশ ও পতন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সূচনা—প্রাচীন ইউরোপের সভ্যতা যেন দুটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত—একটি গ্রীস এবং অন্যটি রোম। রোমের অধিবাসীদের বলা হয় রোমান। রোমানরা আর্য জাতিরই একটি শাখা। তাদের ভাষা ছিল ল্যাটিন। গ্রীসের পতনের পরে এই রোম ইউরোপীয় সভ্যতার দ্বিতীয় কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল। শিক্ষা-দীক্ষা, আইন, দর্শন, শিল্প-সাহিত্য—সব দিকেই এই জাতির অবদান অসামান্য। 'ইনিড' কাব্যের স্রষ্টা মহাকবি ভার্জিল, ট্যাসিটাসের মত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক একদিন এই রোমানদের মধ্য থেকেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। রোম নগরীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এক বিশাল সাম্রাজ্য। আর ঐ বিশাল সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে এক উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব। শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের দিক থেকে রোমনগরী মর্তের নন্দনপুরীতে পরিণত হয়। রোমানদের অতুলনীয় সাহস, বীরত্ব, রণপটুতা এবং তেজস্বিতা ছিল অসামান্য। এই জাতি একদিন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এসিয়া-ইউরোপের মধ্যে এক বিচিত্র সংযোগসূত্র হয়ে উঠেছিল।

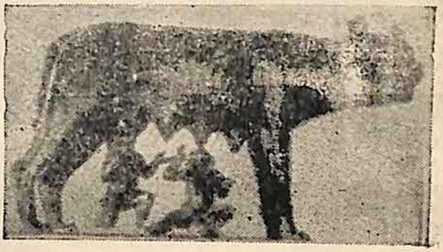
১। রোমের উদ্ভব :

রোম নগরীর উদ্ভব সম্পর্কে একটি সুন্দর কাহিনী প্রচলিত আছে। **রমিউলাস ও রেমাস** নামে দুই ভাই মাতা কর্তৃক নির্জন বনে পরিত্যক্ত হয়। শৈশবে এক নেকড়ের দুধ খেয়ে এরা দুজনে বড় হয়। পরে এক মেষপালকের গৃহে লালিত-পালিত হয়ে যৌবনে পদার্পণ করে। তারা টাইবার নদীর দক্ষিণ তীরের একদল পার্বত্য যুবককে সংগঠিত করে এবং তাদের দলপতি হয়ে ওঠে। অনুগত যুবকদের নিয়ে রেমাস ও রমিউলাস একটি শহর গড়ে তোলে। পরে ভ্রাতৃবিরোধের পরিণতি স্বরূপ রমিউলাসের হাতে রেমাস নিহত হয়। রমিউলাসের নাম অনুসারে নতুন


রোম সাম্রাজ্য
আ ফ্রি কা
আ র ব
মি শ র
ক্রীট
সিরিনিকা
জেরুজালেম
আলেকজান্দ্রিয়া

গড়ে ওঠা নগরের নাম হয় রোম। ধীরে ধীরে রোমে জনবসতি গড়ে ওঠে এবং সাতটি পাহাড়ের ওপর বহু বাড়ি-ঘর নির্মিত হয়।

রেমাস ও রমিউলাসের বৃত্তান্ত রোমদেশে প্রচলিত কাহিনী মাত্র। সব জাতিই নিজেদের শৌর্য-বীর্য ও পরাক্রমের কথা প্রচারের জন্যই এ জাতীয় পৌরাণিক কাহিনী সৃষ্টি করেছে। পূর্বপুরুষেরা যেহেতু নেকড়ের স্তন্যদুগ্ধে লালিত, সেহেতু রোমানরা এক শক্তিশালী জাতি—একথা প্রচারই এই কাহিনীর মূল বিষয়বস্তু।



রমিউলাস ও রেমাস

খুব সম্ভব বাইরে থেকে রোমানরা ইটালীতে এসেছিল। যেখানে টাইবার নদী এসে ভূমধ্যসাগরে পড়েছে তারই পূর্ব ও দক্ষিণ তীরে এসে রোমানরা প্রথমে বসতি স্থাপন করে। ধীরে ধীরে তারা উন্নত হয়। এক নতুন নগরের পত্তন করে। তার নাম দেয় রোম। আর এই রোমকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ আটশ' বছর ধরে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে।

২। রোম ও কার্থেজ সংঘর্ষ :

নতুন নগরের প্রতিষ্ঠার পরে রোমানরা বুঝতে পারে যে, ছোট একটি নগরকে নিয়ে পড়ে থাকলে রোমানদের প্রভাব প্রতিপত্তির কথা কেউই জানতে পারবে না। সেইজন্য প্রয়োজন সাম্রাজ্যের বিস্তার এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টাতে প্রথমেই তাদের দৃষ্টি পড়ে কার্থেজের সমৃদ্ধি আর ঐশ্বর্যের প্রতি।

আফ্রিকার উত্তর উপকূলে ছিল কার্থেজ নগরী। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে ইটালীর দক্ষিণে সিসিলি দ্বীপ এবং তার দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের তীরে এই কার্থেজ বন্দর। কার্থেজের অধিবাসীরা ছিল ফিনিসিয়ান জাতিগোষ্ঠীর একটি শাখা। তারা ছিল নৌ-বলে বলীয়ান এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে খুবই সমৃদ্ধ। তারা পাঁচ সারি মাল্লার প্রকাণ্ড

জাহাজে করে যুদ্ধ করত। উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের কতকাংশ এবং ভূমধ্যসাগরের কয়েকটি দ্বীপ দখল করে কার্থেজের অধিবাসীরা একটি ছোটখাটো সাম্রাজ্য গঠন করে ফেলে। রোম থেকে কার্থেজের দূরত্ব ছিল মাত্র সত্তর মাইল। সেজন্য কার্থেজের শক্তি বৃদ্ধি রোমানদের কাছে ঈর্ষা, ভয় ও আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কার্থেজের শক্তি ক্ষুণ্ণ না করতে পারলে রোমানদের পক্ষে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে বাণিজ্যিক প্রভুত্ব স্থাপন করা কঠিন ছিল। সেজন্যই রোম-কার্থেজ সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

অতি তুচ্ছ কারণ নিয়ে রোম-কার্থেজ বিবাদের সূচনা হয় এবং এই সংঘর্ষ ক্রমশঃ বেড়েই চলে। একশ' বছরেরও বেশী সময় ধরে এই দুই বিবাদমান শক্তির সংঘর্ষ চলেছিল। এদের এই সংঘর্ষকে ঐতিহাসিকেরা নাম দিয়েছেন পিউনিক যুদ্ধ। পিউনিক শব্দের ল্যাটিন অর্থ হলো—কার্থেজ। তাই রোমানরা কার্থেজের সঙ্গে যুদ্ধকে পিউনিক যুদ্ধ বলত। এই যুদ্ধ হয়েছিল তিন-তিনবার।

খ্রীষ্টপূর্ব ২৬৪ অব্দে সিসিলির পূর্বদিকে একজন গ্রীক রাজা রাজত্ব করতেন। প্রায়ই তাঁর রাজ্যে একদল জলদস্যু হানা দিত। এদের দমনের জন্য তিনি কার্থেজের সাহায্য চাইলেন। কার্থেজকে সিসিলির পূর্বদিকে সৈন্যসজ্জা করতে দেখে রোমানরা আগ বাড়িয়ে জলদস্যুদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে নামল। দীর্ঘ পঁচিশ বছর যুদ্ধ চলার পর কার্থেজ পরাজিত হয়। সিসিলি দ্বীপের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব হারিয়ে এবং কয়েক লক্ষ টাকা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিয়ে কোনরকমে কার্থেজ রক্ষা পায়। এভাবেই রোম-কার্থেজ প্রথম যুদ্ধের অবসান ঘটে। রোম ও কার্থেজের মধ্যে এক সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। কিন্তু তার মেয়াদ বিশ বছরের বেশি স্থায়ী হয় না। এর কারণ হল রোমানদের লক্ষ্য ছিল কার্থেজের সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন। আর কার্থেজের উদ্দেশ্য ছিল রোমানদের ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা। তাই দায়সারাভাবে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেও রোমবাসী কিংবা কার্থেজবাসী কেউই চুপচাপ থাকতে পারেনি।

হ্যামিলকার বার্কা নামে একজন রণকুশলী ও স্বদেশপ্রেমিক সেনানায়কের আবির্ভাবে কার্থেজবাসীর প্রতিশোধস্পৃহা তীব্রতর হয়ে ওঠে। তাঁর অপূর্ব সংগঠন শক্তি এবং রণচাতুর্যে শীঘ্রই কার্থেজের সৈন্যদলে সুশিক্ষিত এবং সুগঠিত হয়। হ্যামিলকার ছিলেন স্পেনের শাসনকর্তা।

হ্যানিবল ঃ হ্যামিলকারের সুযোগ্য পুত্র ছিলেন হ্যানিবল। মাত্র এগারো বছর বয়সেই হ্যানিবল তাঁর বাবার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে রণকৌশল আয়ত্ত করেন। অল্পদিনেই তিনি একজন সুদক্ষ সেনানায়কে পরিণত হন। পিতা হ্যামিলকার পুত্র হ্যানিবলকে কার্থেজের চিরশত্রু রোমকে শায়েস্তা করবার জন্য প্রতিজ্ঞাবন্ধ করান। হ্যানিবলও তাঁর পিতার আদর্শে উদ্দীপিত হয়ে ওঠেন। হ্যামিলকারের মৃত্যুর পরে কার্থেজ বাহিনীর সেনানায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন হ্যানিবল। হ্যানিবলের অমিত বিক্রম ও রণকৌশলের জন্য কার্থেজের সৈন্যদল দীর্ঘ পনের বছর ইটালীর প্রান্তরে ভীষণ সংঘর্ষ চালায়। তাতে রোমান বাহিনী পরাজিত হয়। স্থলযুদ্ধে হ্যানিবল ছিলেন অজেয়। তাই সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে রোমানরা স্পেন ও সিসিলিতে সৈন্য পাঠিয়ে কার্থেজের সেনাবাহিনীর রসদ সরবরাহের পথ বন্ধ করে দেয়। এভাবে লোক ও রসদের অভাবে হ্যানিবলের বাহিনী ক্রমশঃ হীনবল হয়ে পড়ে। তখন রোমান সেনাপতি সিপিও কার্থেজের ওপর প্রবল আঘাত হানেন। স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হ্যানিবল স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু জামার রণপ্রান্তরে তাঁর সৈন্যদলের শোচনীয় পরাজিত ঘটে। লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং কোনরূপ যুদ্ধে লিপ্ত না হবার শর্তে কার্থেজ সন্ধি করে। বীর সেনানায়ক হ্যানিবল দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসিয়ায় চলে যান। রোমানরাও তাঁর পিছনে তাড়া করে বেড়ায়। শেষ পর্যন্ত হ্যানিবল বিষপানে আত্মহত্যা করে অপমানের জ্বালা থেকে মুক্তিলাভ করেন।

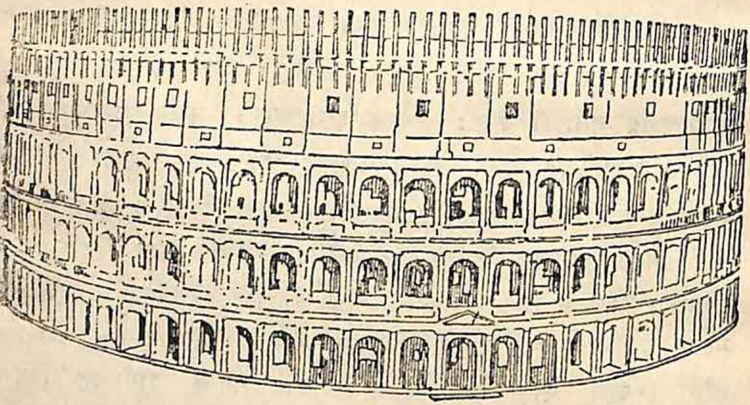

হ্যানিবল

হ্যানিবল ছিলেন সর্বযুগের সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক। তাঁর দৃঢ়তা, তেজস্বিতা স্বদেশপ্রেম এবং রণনৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের সঙ্গেই একমাত্র তাঁর তুলনা করা চলে। রোম-কার্থেজের দ্বিতীয় বার সংঘর্ষে কার্থেজের পরাজয় হলেও মহাবীর হ্যানিবলের বীরত্ব নিষ্ফল হয়নি।

এতেও রোমানদের ক্ষোভের উপশম হয় না। কেটো নামে একজন রোমান সেনানায়ক কার্থেজকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার জন্য রোমবাসীকে নতুনভাবে অনুপ্রাণিত করে তোলেন। এরই পরিণতিতে শুরু হয় রোম-কার্থেজের তৃতীয় যুদ্ধ (খ্রীঃ পূঃ ১৪৬ অব্দে) এই যুদ্ধেও কার্থেজ বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। তার আর মাথা তুলে দাঁড়াবার মত কোন সুযোগ থাকে না। কার্থেজের শক্তি নির্মূল করার পরে রোমানদের একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপনের পথ প্রায় নিষ্কণ্টক হয়।

৩। রোমান সমাজ ব্যবস্থা ঃ

রোমে প্রথমে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। ধনী ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। তাঁরা বিলাসবহুল অট্টালিকায় বাস করতেন। রোমের ধনসম্পদ ছিল প্রচুর। বিভিন্ন দেশ থেকে এখানে নানারকম মূল্যবান সামগ্রী আমদানী করা হত। রোম সুন্দর সুন্দর অট্টালিকায় সুসজ্জিত ছিল। ঐগুলির মধ্যে কলোসিয়াম নামে প্রেক্ষাগৃহ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের বসার আসন ছিল।



কলোসিয়াম

সেখানে সিংহের সঙ্গে মানুষের লড়াই হত। রোমবাসী এ ধরনের লড়াই দেখতে ভালবাসত। এখানে নানা শ্রেণীর লোকের বাস ছিল। কেউ ছিলেন রাজকর্মচারী, কেউবা সৈনিক। আর ছিল বহুসংখ্যক ক্রীতদাস। এরা সম্ভবত ছিল রোমের দ্বারা পরাজিত সাম্রাজ্যগুলির বন্দী সৈনিক। রোমের জনগণ আমোদ-প্রমোদ ভালবাসত। সেখানে চিত্ত বিনোদনের নানা উপায় ছিল। তার মধ্যে বন্দী ক্রীতদাস কিংবা মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত

সৈনিকদের সঙ্গে বন্য জন্তুর লড়াই ছিল সবচেয়ে উপভোগ্য খেলা। রোমানরা সাহিত্যের অনুরাগী ছিল। এদেশেই জন্মেছিলেন ভার্জিল। তাঁর লেখা অ্যানিড একটি বিশ্ববিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। রোমক ঐতিহাসিক ট্যাসিটাস খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের সুন্দর বিবরণ লিখে গেছেন। রোমান সম্রাটগণ সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, স্নানাগার, মন্দির, বিজয়স্তম্ভ ইত্যাদি নির্মাণ করিয়ে রোম নগরীকে সুসজ্জিত করে তোলেন। রোমের আর একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি অ্যাম্ফিথিয়েটার নামে স্টেডিয়াম। কলোসিয়ামের বহিঃপ্রাঙ্গণে গ্যালারি ঘেরা এই স্টেডিয়ামে জন্তু-জানোয়ারদের লড়াই হতো।

প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান—ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য মিশর-মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার সময়কাল থেকে প্রচলিত। রোমে এই বৈষম্য তীব্র আকার ধারণ করে। রোমের জনসাধারণ প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান এ দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। সাধারণতঃ অবস্থাপন্ন ধনী ও বিত্তশালী লোকদের বলা হতো **প্যাট্রিসিয়ান** বা অভিজাত। অনভিজাত দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের বলা হতো **প্লিবিয়ান**। এই প্লিবিয়ানদের অধিকাংশ ছিল অসহায় ক্রীতদাস। এই ক্রীতদাসেরা ছিল শত্রুপক্ষের কোন সৈনিক। যুদ্ধজয়ের পরে রোমানরা বন্দী শত্রু-সেনাদের ক্রীতদাসে পরিণত করত।


রোমান ক্রীতদাস

এই প্লিবিয়ানদের দিয়ে প্যাট্রিসিয়ানরা ঘরের কাজ, চাষবাস বা কল-কারখানায় মজুর খাটান। কঠোর পরিশ্রম করেও প্লিবিয়ানরা দু'মুঠো পেট পুরে খেতে পেত না। কথায় কথায় তাদের প্রভুর কাছ থেকে লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করতে হতো। এই প্লিবিয়ানরা ছিল নিঃস্ব। এদের বাসস্থান কিংবা চাষযোগ্য জমি—এসব কিছুই ছিল না। তারা অন্যের জমিতে চাষ করত। কোনো রকমে মাথা গুঁজে পড়ে থাকত। কাজের সামান্য কিছু গাফিলতি হলেই পিঠে পড়তো চাবুক। তাদের জন্তু-জানোয়ারের মতো মনে করা হতো। কলোসিয়াম নামে বিশাল প্রেক্ষাগৃহে অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা বাঘ, সিংহ প্রভৃতি নরখাদক পশুর সামনে বন্দী ক্রীতদাসকে ফেলে দিত। হিংস্র জন্তু থাবা দিয়ে অসহায় মানুষটিকে টুকরো টুকরো করে ফেলত। আর এই দৃশ্য আনন্দে উপভোগ করত অভিজাত শ্রেণী।

৪। রোমান নাগরিকত্ব অর্জন ও দাস বিদ্রোহ :

রোম দেশের আইন ছিল ধনীদের জন্য রচিত। কেননা দেশ চালাত ধনী প্যাট্রিসিয়ানরা। অসহায় প্লিবিয়ানদের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। তারা দেশের কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল।

ইতিহাসে যেদিন থেকে কৃষির উদ্ভব, সেদিন থেকেই মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন এবং তা রক্ষণের আকাঙ্ক্ষা জাগে। সমাজে চালু হয় শোষণ। নিঃস্ব দরিদ্র শ্রেণীকে অশেষ লাঞ্ছনা ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়। অনাহার আর দুঃখ-দুর্দশা হয়ে ওঠে নিত্যসঙ্গী। ধনীর শোষণ আর দারিদ্র্যের নিষ্পেষণের চরম পরিণতি রোমের দাস বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ধনীর প্রাসাদ আর ঐশ্বর্যের মূলে যে দরিদ্র ক্রীতদাসশ্রেণী তারা এক সময়ে বিদ্রোহ করল। তাদের দাবি ছিল সুবিচার লাভ এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করা।

স্পার্টাকাস—খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতকে স্পার্টাকাস নামে একজন বীর সেনানীর নেতৃত্বে প্রায় সত্তর হাজার সুশিক্ষিত ক্রীতদাসের এক সৈন্যদল গঠিত হয়। এরা প্যাট্রিসিয়ানদের একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এতে বহুসংখক সৈনিকের প্রাণহানি ঘটে। কিন্তু প্যাট্রিসিয়ানরা নিজেদের ক্ষমতা ও প্রভুত্বের নিরঙ্কুশ অধিকার থেকে বঞ্চিত হবার আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে ওঠে। নামেমাত্র রাজনৈতিক অধিকার দিয়ে তারা এ যাত্রায় প্লিবিয়ানদের মুখ বন্ধ করে রাখে। এভাবে প্রথম পর্যায়ের অন্তর্কলহের পরিণতিস্বরূপ রোমান সাম্রাজ্যের ভাঙনের আশঙ্কা দূর হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে এই বিদ্রোহ চূড়ান্ত রূপ নেয়। বহু ক্রীতদাস যুদ্ধে প্রাণ হারায়।

রোমে রাজতন্ত্রের অবসান : রোমে প্রথমে ছিল রাজতন্ত্র। রাজাদের বিলাসিতা, স্বেচ্ছাচারিতা এবং অপদার্থতা এক সময়ে চরম আকার ধারণ করে। তখন রোমান সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দেশ ও জাতির স্বার্থে রোমানরা রাজতন্ত্রের বিনাশ ঘটায়। তার পরিবর্তে কনসাল নামে দুইজন সদস্যের ওপর দেশ শাসনের ভার অর্পিত হয়। কনসালদের বুদ্ধি-পরামর্শ দেবার জন্য ছিল সেনেট। এই সেনেটের সভ্যপদ পেতেন শুধু অভিজাত বা প্যাট্রিসিয়ানরা। প্লিবিয়ানদের কোন রাজনৈতিক অধিকার বা সুবিধা ছিল না। পরবর্তীকালে ক্রীতদাসদের রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের দাবি খুবই গুরুত্ব লাভ করেছিল। শুধু ক্রীতদাসেরাই নয়, বিদেশী মেয়েরাও

এই অধিকার পেত না। মধ্যবিত্তদের অধিকার ছিল সীমাবদ্ধ। দীর্ঘদিনের অনৈক্য, অসন্তোষ ও বৈষম্য দূর করার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছিল বহুদিন।

৫। জুলিয়াস সীজার :

রোমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবার পরে কন্সালদের মধ্যে অনেকেই খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই রাজতন্ত্রকে আবার ফিরিয়ে আনবার জন্য ভেতরে ভেতরে চেষ্টা করতে থাকেন। তাঁরা নিজেদের ঈশ্বরের অবতার বলেও প্রচার করতেন এবং দেশের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। জুলিয়াস সীজার ছিলেন এঁদেরই মধ্যে একজন একনায়ক।



জুলিয়াস সীজার

প্রথমে তিনি ছিলেন একজন শক্তিমান সেনাপতি। বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি অসামান্য বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ক্রমশঃ তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা বেড়ে যায়। তিনি কন্সাল হন। পরে একনায়ক হয়ে ওঠেন। প্রথম দিকে তিনি রাস্তা নির্মাণ, খাল খনন, বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি বহু জনহিতকর কাজ করেছিলেন। তাঁর প্রভাব ও প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে বেড়ে যায়। তিনি রাজা হবার স্বপ্ন দেখেন। তিনি হয়ে ওঠেন ক্রমশঃ স্বেচ্ছাচারী। সেনেটের কিছু সভ্য তাঁর জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে বিচলিত হয়ে পড়েন এবং তাঁদের হাতে জুলিয়াস সীজারের মৃত্যু হয়।

জুলিয়াস সীজারের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অগাস্টাস অক্টাভিয়ান সীজার নাম নিয়ে রোমের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন এবং নিজেকে সম্রাটরূপে ঘোষণা করেন। এভাবে রোমের ইতিহাসে প্রথমে রাজতন্ত্র, পরে সাধারণতন্ত্র

এবং এরপর একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে। অগস্টাসের সম্রাট উপাধি ধারণের মধ্য দিয়ে আবার রোমের রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। অগস্টাস সীজারের পরে নীরো, ক্যালিগুলা, মার্কাস অরোলিয়াস প্রভৃতি বহু খামখেয়ালী সম্রাট রোমের সিংহাসনে বসেন। বিশাল রোমান সাম্রাজ্য সুশাসনে রাখার মত যোগ্যতা বা কর্মদক্ষতা এঁদের কারুরই ছিল না। এর সুযোগ নিয়ে বাইরের শত্রুরা ক্রমাগত রোমে আঘাত হানে। অন্যদিকে রোমানরা অন্তর্কলহে ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে।

রোমান সাম্রাজ্যের পতন—রোমান সাম্রাজ্যের আয়তনের বিশালতা; দেশের অভ্যন্তরীণ বিরোধ, উপযুক্ত শাসকের অভাব এবং শত্রুদের ক্রমাগত আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্য ক্রমশঃ দুর্বল হতে থাকে।

প্রথম শতকে খ্রীস্টান ধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রীস্ট প্যালেস্টাইনের জুডিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। সেখান থেকেই খ্রীস্টান ধর্ম রোমান সাম্রাজ্যের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। যীশুর জন্মের তিনশ' বছর ব্যবধানে সম্রাট কনস্টান্টাইন খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। শীঘ্রই রোমানরা তাদের বিজিত সাম্রাজ্যেও খ্রীস্টান ধর্মের প্রচার চালায়। অল্পদিনের মধ্যেই রোমানদের চেষ্টায় এসিয়া, ইউরোপের বহু লোক খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করে। শীঘ্রই রোম নগরী হয়ে ওঠে খ্রীষ্টানদের পবিত্র তীর্থ নগরী। আর রোমের পোপ হয়ে ওঠেন খ্রীস্টান ধর্মের প্রধান গুরু বা নিয়ামক।

অনুশীলনী

[ক] বড় প্রশ্ন

১। রোম নগরীর উদ্ভব সম্পর্কে কি জান?

২। রোম-কার্থেজ সংঘর্ষের একটি বিবরণ দাও।

৩। রোমে দাসপ্রথা এবং ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ সম্পর্কে কি জান?

৪। রোমান নাগরিকত্ব অর্জন ও দাসবিদ্রোহ সম্পর্কে যা জান লেখ।

৫। রোমান রাজতন্ত্র হতে জুলিয়াস সীজার পর্যন্ত ইতিহাস সংক্ষেপে লেখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান বলতে কি বোঝ ?
২। হানিবলের বীরত্ব ও রণনৈপুণ্যের পরিচয় দাও।
৩। প্রাচীন রোমান সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে কি জান ?

বুদ্ধির প্রশ্ন

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) প্রাচীন ইউরোপের সভ্যতা যেন দুইটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি — এবং অন্যটি —। (খ) আফ্রিকার — উপকূলে ছিল — নগরী। (গ) হ্যামিলকারের সুযোগ্য পুত্র ছিলেন —। (ঘ) রোম-ঐতিহাসিক— খ্রীষ্টীয় — শতকের সুন্দর বিবরণী লিখে গেছেন।

মৌখিক প্রশ্ন

(ক) ল্যাটিন কি ? (খ) ভার্জিল কে ছিলেন। (গ) রোমনগরী কার নাম অনুসারে গড়ে উঠেছে ? (ঘ) প্যাট্রিয়ান ও প্লিবিয়ান বলতে কি বোঝ ? (ঙ) কার্থেজ কোথায় ছিল। (চ) সিপিও কে ছিলেন ? (ছ) কেটো কে ? (জ) কলোসিয়াম কি ?

পঞ্চম অধ্যায় | প্রাচীন চীন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সূচনা—হোয়াংহো-ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরে সুদূর অতীতে কিভাবে চীনে এক উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল তার কথা তোমরা পূর্বের অধ্যায়ে পাঠ করেছ। লোকচক্ষুর অগোচরে কেমন করে চীনের সভ্যতা আরও বিকশিত, সমৃদ্ধ ও উন্নত আকার ধারণ করে বর্তমানে আমরা সেটাই পাঠ করব। দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক ব্যবধান চীনকে দিয়েছিল স্বতন্ত্র মহিমা। সেজন্য চীনের সভ্যতায় অন্যান্য সভ্যতা থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় মেলে। অন্য দেশের মত এখানেও বহু রাজবংশের উত্থান-পতন ঘটেছিল। এক একটি রাজবংশ বহুদিন ধরে রাজত্ব করছিল। বাইরের শত্রু হঠাৎ করে এদেশে অভিযান চালাতে পারত না।

১। মহান শাং রাজবংশ:

চীনে প্রথমে বহু ছোট ছোট রাজ্য ছিল। রাজায় রাজায় সর্বদা বিবাদ-বিসম্বাদ লেগে থাকত। ধীরে ধীরে সমগ্র চীনে একজন মাত্র সম্রাটের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। খ্রীটপূর্ব অষ্টাদশ শতকে শাং বা ইন্ বংশের সম্রাটেরাই এখানে প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এক অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে এই বংশের রাজা টাং অমরত্ব অর্জন করেন। শাং বংশের সম্রাটেরা খুবই জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাই তাঁদের আখ্যা দেওয়া হতো দেবতার পুত্র। চীনের অধিবাসীদের পক্ষে পূজা ও যজ্ঞ করবার অধিকারী একমাত্র তাঁরাই ছিলেন। হোনান অঞ্চলের মাটি খুঁড়ে শাং বংশের রাজাদের সময়কার বহু নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেগুলি বড়ই অদ্ভুত এবং বিচিত্র ধরনের। শাং বা ইন্ বংশীয় রাজাদের রাজধানীর ভগ্নস্তূপের সন্ধানও পাওয়া গেছে। একে বলা হয় য়িন-এর ঢিপি। এখানে কচ্ছপের খোলায় লেখা, লিপি ও আঁকা ছবি, তীর ও বর্শা দ্বারা কুকুর, শূয়র, ষাঁড় জাতীয় জন্তু শিকারের ছবি, মাটির ও এনামেলের পাত্র, ব্রোঞ্জের বাসন ইত্যাদি পাওয়া গেছে। শাং বংশীয় সম্রাটেরা প্রায় সাড়ে ছয়শ' বছর রাজত্ব করেছিলেন।

তাদের রাজত্বকালে খাল খনন, বাঁধ সংস্কার এবং স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের খুবই উন্নতি হয়েছিল। এই বংশের পতনের পরে শুরু হয় চউ বংশের রাজত্বকাল। সেটাও চলেছিল প্রায় সাড়ে নয়শ' বছর।

২। কনফুসিয়াস:

ভারতবর্ষে যেমন বুদ্ধ, মহাবীরের মত ধর্মসাধকের জন্ম হয়েছিল—চীনেও তেমনি বহু ধর্মসাধক ও সমাজসংস্কারকের জন্ম হয়। এঁদের মধ্যে কনফুসিয়াসের নাম সবিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

চীনের 'লু' প্রদেশে আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে কনফুসিয়াসের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন খুবই মেধাবী ও প্রতিভাধর। সাধারণ পরিবারে জন্মেও তিনি নিজের চেষ্টায় সুশিক্ষিত হয়ে ওঠেন। তাঁর গুণের পরিচয় পেয়ে 'লু'-য়ের রাজা তাঁকে তাঁর পরামর্শদাতা নিযুক্ত করেন। শীঘ্রই তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে 'লু' একটি আদর্শ রাজ্যে পরিণত হয়। পরে কনফুসিয়াস রাজকীয় চাকুরী ও পদমর্যাদা ত্যাগ করে শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত হন। কিছুদিন বাদে তিনি তাঁর আদর্শ ও উন্নত ভাবধারা প্রচারের জন্য চীনের বিভিন্ন স্থানে পর্যটন করেন। কনফুসিয়াসের আদর্শ ও ভাবধারাকে নিয়ে গড়ে ওঠে এক নতুন মতবাদ। একে বলা হয় কনফুসিয়াসের মতবাদ।

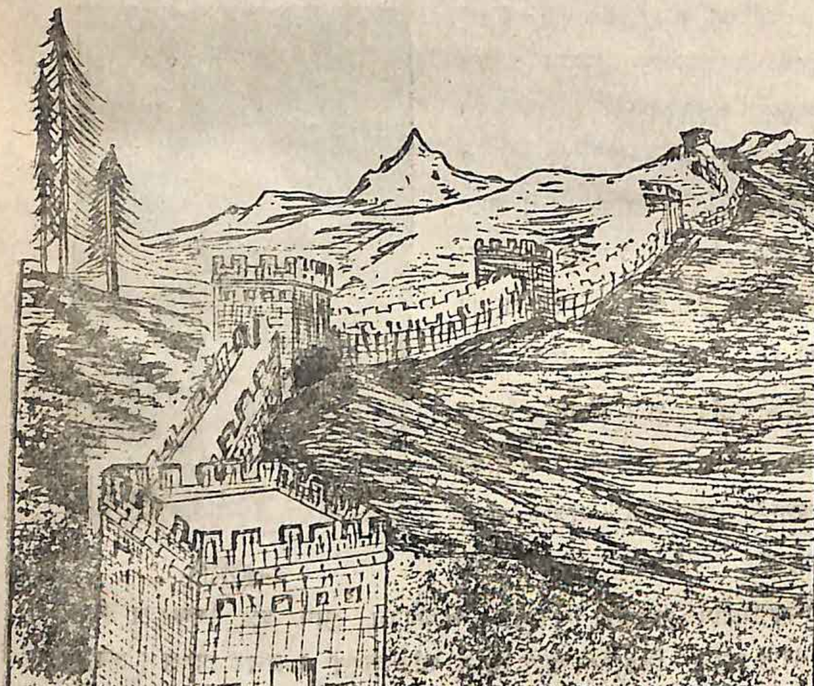


কনফুসিয়াস

কনফুসিয়াসের মতবাদ—কনফুসিয়াসের মতবাদ লোকধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিভাবে জীবনকে উন্নত ও আদর্শনিষ্ঠ করে তোলা যায় তিনি সেই কথাই বলেছিলেন। কনফুসিয়াস চীনের বিভিন্ন স্থান পর্যটন করে লক্ষ্য করেন ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য, স্বেচ্ছাচার ও দুর্নীতির পঙ্কিলতা।

এই দুরবস্থার হাত থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় এবং জীবনকে সুন্দর ও আদর্শনিষ্ঠ করে তোলা যায়—তিনি সেই শিক্ষাই দিয়ে গিয়েছেন। তিনি প্রত্যেক মানুষকে স্বার্থত্যাগ ও চিত্তসংযমের উপদেশ দেন। কনফুসিয়াসের মৃত্যুর পরে তাঁর মতবাদ ক্রমশঃ সমগ্র চীনে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে।

চীনের প্রাচীর—পাহাড়-পর্বতের প্রাকৃতিক বেষ্টনকেই চীনারা যথেষ্ট মনে করতে পারেনি। তাই তারা গড়ে তুলেছিল এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর। চীনের পূর্বদিক বরাবর প্রায় ২৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই প্রাচীরটির উচ্চতা কমবেশী ৬ মিটার। চৈনিক সম্রাট শি-হুয়াংতির আমলে এই প্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরু হয়। অসংখ্য কারিগরের দীর্ঘ পরিশ্রম এবং অপর্যাপ্ত অর্থ ব্যয়



চীনের প্রাচীর

করে এটি নির্মিত হয়েছিল। পোড়া মাটির তৈরী ইট ও পাথর দিয়ে নির্মিত প্রাচীরটির ওপরে ওঠার সিঁড়ি আছে। আর আছে সেখানে ছোট-বড় বহু পাহারাঘাঁটি। সেখান থেকে সৈনিকেরা সর্বদা নজর রাখত যাতে কোন আক্রমণকারী হঠাৎ করে চীনে হানা না দেয়। চীনের এই প্রাচীর বিশ্ববিখ্যাত।

পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্যজনক সৃষ্টিরূপে আজও বিরাজিত। প্রাচীন চীনারা কারিগরি ক্ষেত্রে যে কি অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেছিল চীনের প্রাচীর তারই জ্বলন্ত নিদর্শন।

চীনা সাম্রাজ্য—প্রাচীর নির্মাণের পূর্বে মাঝে মাঝে বাইরের কতকগুলি উপজাতি চীনে হামলা চালাত। কিন্তু প্রাচীর নির্মাণের পরে বিদেশীরা সহসা এদেশে হানা দিতে পারেনি। তাই এক একটি রাজবংশ দীর্ঘকালব্যাপী দেশ শাসন করেছে। বিদেশী জাতির সংস্পর্শে না আসার জন্য চীনারা তাদের স্বতন্ত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতি আঁকড়ে রেখেছিল দীর্ঘকাল। চীনের সম্রাটেরাও নিজের দেশের বাইরে অভিযান চালাতে সাহস করেন নি। এমনি করেই বহুদিন চীনাদের সাম্রাজ্য স্বদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং স্থায়ীভাবে ছিল। 'চউ' বংশের পরে 'চীন' বংশীয় সম্রাটেরা উত্তর ও দক্ষিণ চীনে একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপন করেন। 'চীন' বংশীয় শি-হুয়াংতি সব প্রথম সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর সময় থেকেই চীন প্রকৃত সাম্রাজ্যের গৌরব অর্জন করে। চীন বংশীয়দের নামানুসারে এদেশের নাম হয় চীন। তবে পরবর্তীকালে বাবরের শত্রুর আক্রমণে, নিজেদের ঘরোয়া কহল-বিবাদ, দুর্বলতা ও অক্ষমতার জন্য চীনা সাম্রাজ্য ক্রমশঃ হীনবল হয়ে পড়ে।

অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন

১। চীনের শাং-বংশের রাজত্বকালের একটি বিবরণ দাও।

২। কনফুসিয়াস কে ছিলেন? তাঁর শিক্ষা কি ছিল?

ছোট প্রশ্ন

১। চীনের প্রাচীর সম্বন্ধে কি জান? কে এই প্রাচীর নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন?

২। প্রাচীন চৈনিক সাম্রাজ্যের পরিচয় দাও।

বুদ্ধির প্রশ্ন

১। উক্তিটি যথার্থ কি না তা 'হ্যাঁ' বা 'না' লিখে নির্দেশ কর ঃ

(ক) কনফুসিয়াস চীনের হুনান প্রদেশে জন্মগ্রহণ করে।

(খ) শাং-বংশীয় সম্রাটদের বলা হতো দেবতার পুত্র।

(গ) চীনারা স্বদেশের বাইরে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) — বা — বংশের সম্রাটেরাই এখানে প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।
(খ) শাং বা — বংশীয় রাজাদের রাজধানীর ভগ্নস্তূপের সন্ধান পাওয়া গেছে। একে বলা হয় — এর ঢিপি। (গ) আড়াই হাজার বছর আগে চীনে — জন্ম হয়। (ঘ) চৈনিক সম্রাট — আমলে এই — নির্মাণের কাজ শুরু হয়।

মৌখিক প্রশ্ন

(ক) 'য়িন'-এর ঢিপি কি ? (খ) টাং কোন্ বংশীয় সম্রাট ? (গ) কনফুসিয়াস কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ? (ঘ) প্রাচীন চীনাদের কোন সৃষ্টি আজও বিশ্ববিখ্যাত ? (ঙ) চীনের প্রাচীরের দৈর্ঘ্য কত ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১। আর্যদের ভারতে আগমন :

সিন্ধু সভ্যতার অবসানের পর সাময়িক কালের জন্য প্রাচীন ভারতের সভ্যতার অগ্রগতি স্তব্ধ হয়েছিল। ২০০০ খ্রীস্টপূর্বে সম্ভবতঃ আর্যজাতির একটি শাখা ভারতে এসে উপস্থিত হয় এবং সিন্ধু নদীর তীরে উপনিবেশ স্থাপন করে। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, আর্য আসলে একটি ভাষা-গোষ্ঠীর নাম। এদের বিভিন্ন শাখা গ্রীস, রোম, ইরাণ প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর আর্যদের প্রকৃত বাসস্থান নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যে মতভেদ আছে—তোমরা সেটাও আগেই জেনেছ। তাই আর্যদের আদি বাসস্থান ডেনিয়ুব নদীর তীরবর্তী অঞ্চল (অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী), দক্ষিণ রুশিয়া অথবা মধ্য এসিয়ায় ছিল কিনা সেই বিতর্কে আমরা যেতে চাই না। মোটামুটিভাবে আর্যদের ভারত আগমন, সভ্যতা স্থাপন এবং তার বিকাশ সম্বন্ধেই আমরা জানার চেষ্টা করব।

২। বেদ ও বৈদিক যুগ :

ভারতে আর্য ভাষাগোষ্ঠীর যে দল এসেছিল তারা সিন্ধু নদীতীরে উপনিবেশ স্থাপন করে ধীরে ধীরে কাবুল থেকে থানেশ্বরের নিকটবর্তী সরস্বতী নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে ও নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতি স্থাপনে উদ্যোগী হয়। নিজেদের ধর্মীয় মতবাদ ও বিশ্বাসকে আশ্রয় করে তাঁরা রচনা করেন তাঁদের ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। বেদ চার ভাগে বিভক্ত ; যথা—(১) ঋক্ (২) সাম (৩ যজুঃ এবং (৪) অথর্ব। প্রত্যেক বেদের আবার চারটি ভাগ ; যথা—(১) ব্রাহ্মণ (২) সংহিতা (৩) আরণ্যক ও (৪) উপনিষদ।

বেদের যে অংশে বিভিন্ন দেবতা ও প্রাকৃতিক শক্তির বন্দনার উদ্দেশ্যে কবিতার স্তোত্র বা প্রণামমন্ত্র লেখা আছে তাকে বলা হয় সংহিতা এবং যে অংশে যাগযজ্ঞ কিভাবে করতে হয় তার বিধান দেওয়া আছে সেই অংশকে বলা হয় ব্রাহ্মণ। বেদের স্তোত্রের মতো সুন্দর কবিতা সাহিত্যে খুব অল্পই আছে।

ঋগ্বেদ সবচেয়ে প্রাচীন। ঋগ্বেদ যখন রচিত হয় তখন আর্যরা পাঞ্জাবে সরস্বতী নদীর চারপাশে বাস করতেন। এই অঞ্চলে সাতটি নদী ছিল। তাই এই জায়গাটির নাম ছিল **সপ্তসিন্ধু**।

বেদ একজনের রচনা নয়। বিভিন্ন যুগে আর্য ঋষিরা সবাই মিলে বেদ রচনা করেছেন। ঋষিরা মুখে মুখে বেদ রচনা করেন। শিষ্যরা গুরুর কাছ থেকে বেদ শুনে শুনে মুখস্থ করে নিত—লেখার কোন ব্যবস্থা ছিল না। শুনে মনে রাখতে হতো বলে বেদের আর এক নাম **শ্রুতি**। বেদের রচনাকালীন সময়কে ভারতের ইতিহাসে বলা হয় **বৈদিক যুগ**।

বেদ আর্যদের প্রধান ধর্মগ্রন্থই শুধু নয়—এতে তৎকালীন সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনধারার ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায়। সেজন্য বেদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

৩। আর্যদের সামাজিক, ধর্মীয় রাজনৈতিক জীবনধারা :

(ক) সামাজিক জীবন—আর্যেরা গঙ্গা-যমুনা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে ধীরে ধীরে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়। ক্রমশঃ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আর্যদের উপনিবেশ গড়ে ওঠে। সেজন্য এ অঞ্চলকে বলা হতো **আর্যাবর্ত**। আর্যেরা কতকগুলি পরিবার নিয়ে গড়ে তুলত এক-একটি দল। দলগুলি কোন বিশেষ অঞ্চলে বাস করে এক-একটি জাতি সৃষ্টি করত। জাতির যিনি প্রধান হতেন তাঁকে বলা হত **রাজা**। ধর্মকর্মে নিযুক্ত থাকতেন পুরোহিত। সমাজে কৃষক, তাঁতি, কামার, কুমার, ব্যবসায়ী ইত্যাদি নানা পেশায় বহু ব্যক্তি লিপ্ত ছিল। আর্যদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি ও পশুপালন। তাঁদের জাতিবিভাগ ছিল প্রধানতঃ চারটি – ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণেরা ধর্মকর্ম করতেন ; ক্ষত্রিয়েরা দেশশাসন ও দেশরক্ষা করতেন ; বৈশ্যেরা ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতেন এবং শূদ্রেরা এই উচ্চ তিন বর্ণের লোকদের সেবা করতেন।

আর্যেরা উৎসব-অনুষ্ঠানে মেতে থাকতেন। তাঁরা জরি ও পশমের পোশাক গায়ে দিতেন এবং মূল্যবান গহনা ব্যবহার করতেন। তাঁদের প্রধান আহার্য ছিল ফল-মূল, দুধ, শাক-সব্জি ও মাছ মাংস। তাঁরা উৎসব-অনুষ্ঠানে সোমরস পান করতেন। গো-পালন ছিল পবিত্র কাজ। তাঁদের অবসর সময় কাটত রথ-চালনা, মৃগয়া, পাশাখেলা, নাচ-গান ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়ে।

(খ) ধর্মীয় জীবন— আর্যেরা প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশকে দেব-দেবী জ্ঞানে বন্দনা করতেন। বৈদিক যুগের সূচনায় আর্যদের প্রধান দেবতা ছিলেন দ্যৌ বা জগৎ পিতা। পরে জল দেবতা বরুণ এবং বৃষ্টি ও বজ্রের দেবতা ইন্দ্রের পূজা প্রচলিত হয়। ক্রমে মিত্র, অগ্নি, রুদ্র, পৃথিবী, ঊষা প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজাও প্রচলিত হল। দেব-দেবী বন্দনার প্রধান উপায় ছিল যজ্ঞ। যজ্ঞের পরে বৈদিক স্তোত্র পাঠ করে দেব-দেবীর করুণা প্রার্থনা করা হতো। যজ্ঞে নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হতো। পশুবলিরও প্রচলন ছিল। যজ্ঞের পরে আর্যেরা সোমরস পান করতেন। যাগ-যজ্ঞ ও পূজা করার একমাত্র অধিকারী ছিলেন পুরোহিত। সমাজে তাঁদের বিশেষ মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা ছিল। তাঁরা তাদের খেয়াল-খুশিমত ধর্মের বিধান দিতেন। কখনও কখনও নরবলির বিধান দিতেও দ্বিধা বোধ করতেন না।

(গ) রাজনৈতিক জীবন—রাজাই ছিলেন জাতির প্রধান ব্যক্তি ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাঁর প্রধান দায়িত্ব ছিল দেশরক্ষা ও প্রজাপালন। শত্রুর হাত থেকে দেশরক্ষার জন্য রাজা সৈনবাহিনী পরিচালনা করতেন। রাজাকে যুদ্ধের সময় সাহায্য করতেন সেনাপতি। রাজা রাজপ্রাসাদে বাস করতেন। রাজাকে দেশশাসন ব্যাপারে বুদ্ধি-পরামর্শ দেবার জন্য ছিল 'সভা' ও 'সমিতি নামে জনসাধারণের দুটি সংগঠন। তখন লোহার তৈরী তীর, ধনুক, বর্শা, তলোয়ার, কুঠার জাতীয় অস্ত্রের সাহায্যে সৈনিকেরা যুদ্ধ করত। এক একজন রাজা নূতন নূতন রাজ্য জয় করে পরাক্রমশালী হতেন।

৪। মহাকাব্যের যুগ ঃ

বৈদিক যুগের শেষ ভাগের আর্যদের জীবনধারার পরিচয় পাওয়া যায় বাল্মীকি রচিত রামায়ণ ও ব্যাসদেবের লেখা মহাভারতে। সেজন্য এই দুটি মহাকাব্যের রচনাকালকে বলা হয় মহাকাব্যের যুগ। গ্রীকদের ইলিয়াড-ওডিসির মত রামায়ণ-মহাভারতে বেদোত্তর কালের ভারতবাসীর জীবনধারা সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়।

তখন আর্য রাজারা নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে বিজয়-অভিযান চালাতেন। এক একজন রাজা বহু ছোট-খাট রাজ্য জয় করে প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করতেন। বিজয়ী রাজা তখন 'একরাট', 'সম্রাট' 'রাজচক্রবর্তী উপাধি

ধারণ করতেন। কখনও-বা কোন রাজা তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যজ্ঞ করে একটি ঘোড়া ছেড়ে দিতেন। অন্য কোন রাজা যদি সেই ঘোড়াকে বাধা দিতেন, তবে তাঁর সাথে যুদ্ধ বাধত। ঘোড়া স্বাধীনভাবে নানা দেশ পর্যটন করে ফিরে এলে সেই ঘোড়াকে উৎসর্গ করে যে যজ্ঞ হতো তাকে বলা হতো অশ্বমেধ যজ্ঞ। পরাজিত রাজারা যজ্ঞের সময় উপস্থিত থাকতেন। বিজয়ী রাজা 'রাজচক্রবর্তী' উপাধি ধারণ করতেন। অনেক সময় রাজসূয় যজ্ঞ করেও রাজারা 'রাজচক্রবর্তী' হতেন।

মহাকাব্যের যুগে ধর্মীয় জীবনেও জটিলতা দেখা দেয়। রাজার সাথে সাথে পুরোহিতেরও ক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটে। অনেক নূতন নূতন দেব-দেবীর বন্দনা শুরু হয়।

রাজারা নূতন দেশজয় ও 'রাজচক্রবর্তী' উপাধি গ্রহণ করলেও তাঁরা কখনও স্বেচ্ছাচারী হতেন না। প্রজাদের ইচ্ছা বা অভিপ্রায়কে অমর্যাদা করতেন না। সমাজে সব কাজকেই গুরুত্ব ও প্রতিষ্ঠা দেওয়া হতো। কখনও কখনও রাজারা হলকর্ষণ করতেও দ্বিধা বোধ করতেন না। সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে এই সময়ে পূর্বের তুলনায় কিছুটা জটিলতা দেখা দেয় এবং এই সময়েই জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হয়।

৫। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব :

তোমরা আগেই জেনেছ, আর্যেরা ভারতে এসে প্রথমে সিন্ধু নদীর তীরে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। তাঁরা 'স' কে 'হ' এর মত উচ্চারণ করত। আর তাতে সিন্ধু শব্দটি উচ্চারিত হয় হিন্দু। সাধারণতঃ বৈদিক আর্যদের ধর্ম বোঝাতে হিন্দু শব্দটি ব্যবহৃত হয়। বেদোত্তর যুগে যাগযজ্ঞ পশুবলির বাড়াবাড়ির জন্য হিন্দুধর্মে জটিলতা দেখা দেয়। পুরোহিতের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। ধর্মের নামে চলে অযৌক্তিক বিধান। এমন কি পশুবলির সাথে সাথে নরবলিও চলে। সেজন্য হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে অনেকের মনে নানা প্রশ্ন জাগে। তারই পরিণতিতে খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে উদ্ভব হয় জৈন ও বৌদ্ধধর্মের।

মহাবীর প্রচারিত জৈনধর্ম ও গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্মের ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। অল্পদিনের মধ্যেই এই দুই ধর্মের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। এই সময়ে জনসাধারণও স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্মীয় মতামত ব্যক্ত করে। যাগযজ্ঞ বলিদান প্রভৃতি নিন্দিত হয়। ফলে সারাদেশে ধর্মবিপ্লব দেখা দেয়।

(১) মহাবীর—মহাবীর আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে উত্তর বিহারের বৈশালী নগরে এক ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জৈন ধর্মের চব্বিশজন তীর্থঙ্কর বা ধর্মপ্রচারকের মধ্যে শেষতম তীর্থংকর। সম্ভবতঃ জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পার্শ্বনাথ। মহাবীরের প্রচারের ফলে জৈন ধর্মের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে। পার্শ্বনাথ জৈনদের জন্য যে চারিটি ব্রত বা নিয়ম (অহিংসা, অমৃত, অচৌর্য ও অপরিগ্রহ) নির্দেশ করেছিলেন। তাদের একত্রে বলা হয় চতুর্যাম। মহাবীর এদের সঙ্গে জিতেন্দ্রিয়তার সংকল্প যোগ করেন। পার্শ্বের শিষ্যেরা সাদা বস্ত্র পরিধান করতেন বলে তাঁদের বলা হয় শ্বেতাম্বর। আর মহাবীরের অনুগামীগণ কোন বস্ত্র পরিধান করতেন না বলে তাঁদের বলা হত দিগম্বর।



মহাবীর

মহাবীর ত্রিশ বৎসর সাংসারিক জীবনযাপন করার পরে ঘর-ছাড়া হন। সংসারের ভোগ-সুখ, বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করে সন্ন্যাসীর বেশে বিভিন্ন স্থানে পর্যটন করেন। দীর্ঘ বারো বছর তিনি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন—হিংসা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপু মানুষের মুক্তির পথে প্রতিবন্ধক। যিনি এসব রিপু জয় করে জীন (জয়ী) হতে পারবেন—তিনিই মুক্তি লাভ করবেন। সর্বজীবের কল্যাণের চেষ্টা এবং অহিংসাই ছিল তাঁর মতে পরম ধর্ম। তিনি মানুষের মুক্তির জন্য কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনকে প্রধান উপায় স্বরূপ মনে করতেন। তিনি মগধ, বিদেহ, অঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যে জৈন ধর্ম প্রচার করেন। দক্ষিণ-বিহারের পাবা নামক স্থানে ৭২ বছর বয়সে মহাবীরের মৃত্যু হয়।

(২) বুদ্ধদেব—বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধ আনুমানিক ৫৬৬ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দে নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তু নগরে জন্ম গ্রহণ

করেন। তাঁর বাবা শুদ্ধোধন ছিলেন শাক্যবংশীয় রাজা ও একজন ক্ষত্রিয় নায়ক। শৈশবে বুদ্ধদেবের নাম ছিল সিদ্ধার্থ। মাতৃহারা সিদ্ধার্থকে তাঁর মাসী গৌতমী লালন-পালন করেন। সেজন্য তাঁর আর এক নাম গৌতম। ষোল বছর বয়সে সিদ্ধার্থের সঙ্গে যশোধারা নামে একজন সুন্দরী বালিকার বিবাহ হয়। কিছুদিন বাদে রাহুল নামে সিদ্ধার্থের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহন করে।

শৈশব থেকেই সিদ্ধার্থ ছিলেন কিছুটা ভাবুক প্রকৃতির। রাজকীয় ভোগ-বিলাস-ঐশ্বর্য কোন কিছুতেই তাঁর আকর্ষণ ছিল না। মানুষের জীবনে অবশ্যম্ভাবী জরা, বার্ধক্য ও মৃত্যু তাঁকে ভাবিয়ে তুলত। তাই রাজপ্রাসাদ ছেড়ে একদিন তিনি সন্ন্যাসীর বেশে পথে বেরিয়ে পড়লেন। নানা দেশ ঘুরে শেষ পর্যন্ত গয়ার কাছে এক বোধি-বৃক্ষের তলায় বসে তিনি কঠোর তপস্যা শুরু করেন এবং সিদ্ধিলাভ করেন। তখন থেকেই তাঁর নাম হয় বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী এবং তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম হয় বৌদ্ধধর্ম।



বুদ্ধদেব

প্রথমে তিনি কাশীর কাছে সারনাথে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। তারপর দীর্ঘ ৪৫ বছর ব্যাপী বুদ্ধদেব পালি ভাষায় রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, বৈশালী, কপিলাবস্তু প্রভৃতি নানা স্থানে তাঁর ধর্মমত প্রচার করে বেড়ান।

ধর্মমত—বুদ্ধদেব বলতেন—কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন কিংবা ভোগবিলাস কোনটিই যথার্থ মুক্তির উপায় নয়। তাঁর মতে—এই দুইয়ের মাঝামাঝি পথ বা মধ্যম পন্হাই হল মানুষের মুক্তির প্রকৃত উপায়। মধ্যপথের সন্ধান দিতে গিয়ে বুদ্ধদেব আটটি পথ বা অষ্টাঙ্গিক মার্গের উল্লেখ করেছেন ; সেগুলি হল—সম্যক দৃষ্টি সদ্বাক্য, সৎকর্ম, সৎ-সংকল্প, সৎ-জীবন, সৎ-চেষ্টা, সৎ-স্মৃতি ও সম্যক-সমাধি। বুদ্ধদেব মনে করতেন মানুষ যদি দুঃখের কারণ নির্ণয় করে ; তার উৎপত্তির পথ রোধ করতে পারে তবেই সে যথার্থ মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করবে। সত্য, প্রেম অহিংসাকেই তিনি দুঃখ-নিবৃত্তির পরম উপায় বলে মনে করতেন। তাই জীবে দয়া এবং অহিংসাই হল পরম ধর্ম।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করে আনুমানিক ৫৮৬ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে কুশীনগর নামক স্থানে আশী বছর বয়সে বুদ্ধদেব মহানির্বাণ লাভ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর বিভিন্ন সময়ে তাঁর উপদেশাবলী তিনটি পেটিকাসমন্বিত ত্রিপিটক গ্রন্থে সংকলিত হয়। এই ত্রিপিটক গ্রন্থে সংকলিত বিষয়গুলি হল – বুদ্ধের উপদেশাবলী, সংঘ পরিচালনার নিয়মাবলী এবং বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন দার্শনিক তথ্যাদি।

জৈনধর্মে আচার-আচরণের কঠোরতা ও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য সাধারণ গৃহীর পক্ষে এই ধর্মীয় আদর্শ পালন করা কঠিন ছিল। অন্য দিকে বৌদ্ধধর্মের মধ্যপন্থা সকলের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য ছিল। সেজন্য জৈনধর্মের চেয়ে বৌদ্ধধর্ম অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরবর্তীকালে মৌর্য সম্রাট অশোক, কুষাণ সম্রাট কণিষ্ক, পুষ্যভূতিবংশীয় সম্রাট হর্ষবর্ধন এবং পাল রাজাদের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করার জন্য ভারতের বাইরে সিংহল, তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। আজও পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী।

৬। বিভিন্ন রাজা ও রাজবংশ :

অতি প্রাচীনকালে মগধে হর্যঙ্ক, শিশুনাগ ও নন্দবংশের রাজারা রাজত্ব করেন। তাঁদের মধ্যে নন্দবংশীয়দের রাজত্বকাল উল্লেখযোগ্য। এই বংশের একজন অত্যাচারী রাজাকে হত্যা করে চন্দ্রগুপ্ত মগধে মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন আনুমানিক ৩২৪ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে।

(ক) মৌর্যবংশ :

চন্দ্রগুপ্ত—চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যবংশে জন্মেছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে মৌর্যদের উত্তর ভারতের পিপ্পলীবন রাজ্যের একটি ক্ষত্রিয়বংশ বলা হয়েছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে চন্দ্রগুপ্তের মা মুরার নাম থেকেই এই বংশের নাম হয়েছে মৌর্যবংশ। অত্যাচারী নন্দ রাজাদের আদেশে চন্দ্রগুপ্ত কিছুকাল নির্বাসিত জীবনযাপনে বাধ্য হন। খুব সম্ভব এ সময়ে তিনি গ্রীকবীর আলেকজান্ডারের যুদ্ধশিবিরে গ্রীক-রণকৌশল শিক্ষা গ্রহণ করেন। নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধনই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে তিনি চাণক্য বা কৌটিল্য নামে একজন কূটনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সহায়তা লাভ করেন। এভাবে নন্দবংশ ধ্বংস করে তিনি মগধের সিংহাসনে বসেন ও মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন একজন সমরকুশলী সেনানায়ক। তাঁর দূরদর্শিতা ও শাসনদক্ষতা ছিল অসাধারণ। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যে উপযুক্ত রণদক্ষ সেনানায়কের অভাবে অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তারই সুযোগে মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত আলেকজাণ্ডারের অন্যতম সেনাপতি সেলুকসকে পরাজিত করে পাঞ্জাব জয় করেন। সেলুকস চন্দ্রগুপ্তকে কাবুল, কান্দাহার, হিরাট প্রভৃতি কয়েকটি স্থান ছেড়ে দিয়ে সন্ধি করেন। এ ছাড়া সেলুকস তাঁর কন্যার সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ দেন। চন্দ্রগুপ্ত তাঁকে পাঁচশ' যুদ্ধহস্তী উপহার দেন।

মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। তাঁর শাসন ব্যবস্থা ছিল সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত। গঙ্গা ও শোন নদীর সংগমস্থলে পাটলিপুত্র ছিল চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী। এর দৈর্ঘ্য ছিল নয় মাইল ও প্রস্থ দেড় মাইল। শত্রুরা যাতে অতর্কিতে রাজধানীতে হানা দিতে না পারে সেজন্য নগরের চারদিকে ছিল পরিখা এবং শাল কাঠের উঁচু প্রাচীর। রাজপ্রাসাদও ছিল কাঠের তৈরী। রাজধানীর শাসনভার ও সৈন্যবাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব ছিল ত্রিশ জন করে সদস্য নিয়ে গঠিত এক-একটি সভার ওপর ন্যস্ত। এই সভার সভ্যগণ আবার ছয়ভাগে বিভক্ত হয়ে শাসন পরিচালনা করতেন। সাধারণতঃ রাজকুমারদের ওপর ছিল প্রদেশ শাসনের ভার। চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য বা কৌটিল্যের লেখা **অর্থশাস্ত্রে** বলা হয়েছে, চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন প্রজারঞ্জক রাজা। তাকে পরামর্শ দেবার জন্য ছিল একটি মন্ত্রীসভা। বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষের সাহায্যে রাজা দেশ চালাতেন। গুপ্তচরেরা খুবই সক্রিয় ছিল। তারা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে এসে প্রজাদের খবরাখবর রাজাকে দিতেন। সেই অনুযায়ী রাজা প্রজাদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

চন্দ্রগুপ্তের দরবারে সেলুকস **মেগাস্থিনিস** নামে একজন গ্রীক দূতকে পাঠান। তিনি এদেশে কিছুকাল কাটিয়ে স্বদেশে ফিরে যান। পরে তিনি **ইণ্ডিকা** নামক ভ্রমণ-বৃত্তান্তমূলক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাতে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের শাসন দক্ষতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা, চন্দ্রগুপ্তের শাসনকাল সম্বন্ধে জানার ক্ষেত্রে দুটি অপরিহার্য গ্রন্থ।

মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরে আনুমানিক ২৯৮ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দে তাঁর পুত্র **বিন্দুসার** মগধের সিংহাসনে বসেন। তিনি তাঁর কৃতিত্ব ও

দক্ষতায় পিতৃ-সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখেন। শত্রুকে দমন করে 'অমিত্রঘাত' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর রাজত্বের শেষভাগে রাজকুমার অশোক তক্ষশিলার বিদ্রোহী প্রজাদের দমন করে সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন।

অশোক—পৃথিবীর সর্বযুগের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন অশোক। আনুমানিক খ্রীস্ট-পূর্ব ২৭৩ অব্দে তিনি সিংহাসনে বসেন। খুব সম্ভব অশোক প্রথম জীবনে ছিলেন খুবই নিষ্ঠুর প্রকৃতির। কথিত আছে, তিনি তাঁর ভাইদের হত্যা করে মগধের সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে আরোহণের কিছুকাল পরে অশোক কলিঙ্গে অভিযান চালান। অশোকের একটি শিলালিপিতে (ত্রয়োদশ শিলালিপি) এই যুদ্ধের ভয়াবহ ও মর্মান্তিক বর্ণনা দেওয়া আছে। এই যুদ্ধে এক লক্ষ কলিঙ্গবাসী নিহত ও দেড় লক্ষ লোক বন্দী হয়। বহু নগর ও কৃষিক্ষেত্র ধ্বংস হয়। এই যুদ্ধের পরে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। অশোকের এরূপ অমানুষিক নিষ্ঠুরতার জন্য চণ্ডাশোক আখ্যা দেওয়া হয়।

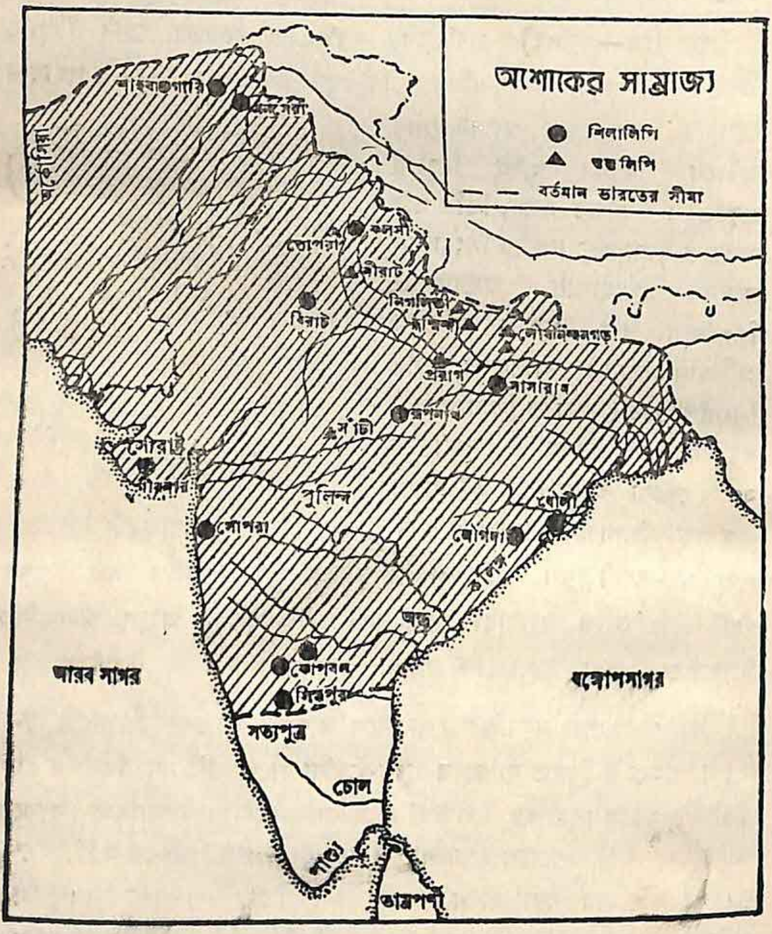


অশোক

কলিঙ্গ যুদ্ধের মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে অশোক অতিশয় অভিভূত হন। যুদ্ধে আহত ও নিহত ব্যক্তিদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে তাঁর মন বিচলিত হয়। তিনি এ সময়ে বোধ হয় উপগুপ্ত নামে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে আসেন। তাঁর উপদেশে চণ্ডাশোকের মনে দেখা দেয় পরিবর্তন। বুদ্ধের প্রেম ও অহিংসার ধর্মে দীক্ষা নেবার জন্য তিনি ব্যাকুল হন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন আর যুদ্ধ করবেন না। তিনি পরে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ বিজয়ের নীতি পরিত্যক্ত হয় ও ধর্ম বিজয়ের নীতি ঘোষিত হয়। এভাবে চণ্ডাশোক ধর্মাশোকে রূপান্তরিত হন।

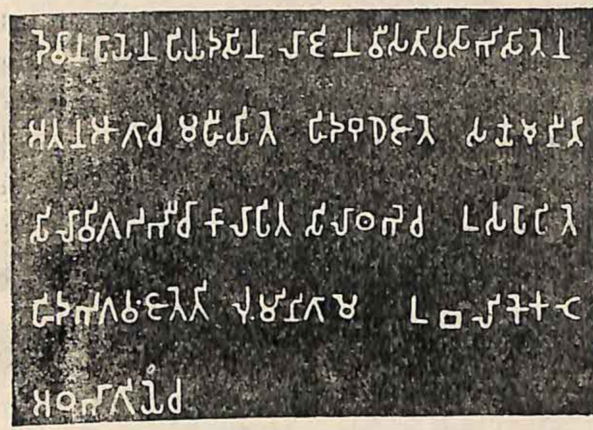
বৌদ্ধধর্ম প্রচার—বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পরে এই ধর্ম প্রচার করাই অশোকের জীবনের আদর্শ হয়ে ওঠে। সর্বজীবে দয়া, অহিংসা পরম ধর্ম —বুদ্ধের এই বাণী সম্রাট নিজে পালন করতেন। তাঁর রাজ্যেও যাতে সে আদর্শ পালিত হয় তিনি সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অশোক বৌদ্ধ

ধর্ম প্রচার ও প্রসারের কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, (১) সম্রাট নিজে ধর্ম প্রচারের জন্য ধর্ম-মহাযাত্রায় বেরুতেন ও বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ প্রচার



করতেন। প্রজাদের ধর্মীয় জীবনের আদর্শ রক্ষার জন্য ধর্মমহামাত্র নামে একদল রাজকর্মচারী নিযুক্ত ছিল। তারা রাজ্যের সর্বত্র ঘুরে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতেন। জীবে দয়া, অহিংসা ইত্যাদি আদর্শ যাতে রাজ্যের সর্বত্র অক্ষুণ্ণ থাকে সেজন্য ধর্মমহামাত্রেরা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। (২) বৌদ্ধ ধর্মের উপদেশগুলি যাতে সকল প্রজা জানতে, বুঝতে এবং হৃদয়ংগম করতে পারে সেজন্য পাথরের স্তম্ভ ও পাহাড়ের গায়ে সেগুলি ব্রাহ্মী বা খরোষ্টী

লিপিতে খোদাই করে রাখা হতো। এই উপদেশ বা অনুশাসন পেশোয়ার থেকে মহীশূর পর্যন্ত নানা জায়গায় দেখা যায়। গয়ার কাছে একটি পাহাড়ের গুহার গায়ে এরূপ খোদাই করা গুহালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই অনুশাসনগুলি সহজ, সরল এবং সর্বজনবোধ্য ছিল। মাতাপিতাকে ভক্তি করবে, জীবে দয়া করবে, হিংসার ভাব মনে পোষণ করবে না, যজ্ঞের জন্য পশুবলি করবে না, সকলের সাথে সমান সদয় ব্যবহার করবে, দান, দয়া, সত্য, পবিত্রতাই পরমধর্ম—এরূপ আরও বহু উপদেশ অনুশাসন-



অশোকের শিলালিপি

গুলিতে খোদাই করে রাখা হতো। (৩) সম্রাট অশোক ভারতের বাইরে সুবর্ণদ্বীপ (সুমাত্রা, জাভা ইত্যাদি স্থানে); সিংহল, পশ্চিম এসিয়া, মিশর, এমনকি করিন্থের রাজদরবারেও দূত প্রেরণ করেন। তাঁর আগে অন্য কোন রাজা বিদেশীকে ধর্মপথে আনতে এরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। দু-একটি ছাড়া সব শিলালিপিতে অশোক নিজেকে, 'প্রিয়দর্শী', 'দেবতার প্রিয়' বলে উল্লেখ করেছেন।

জনহিতকর কার্য—ধর্মাশোক ঘোষণা করেছিলেন, 'তাঁর রাজ্যে রণ-ভেরীর পরিবর্তে ধর্ম-ভেরী বাজবে। সকল মানুষই আমার প্রজা ও সন্তানতুল্য।'—এই পবিত্র আদর্শ সম্রাট অশোক অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। প্রজাদের কল্যাণ সাধনের জন্য তিনি ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালান। পথিকদের সুবিধার জন্য তিনি বড় বড় রাস্তা তৈরী করান। পথের ধারে স্থানে স্থানে

তিনি বৃক্ষ রোপণ, অতিথিশালা নির্মাণ, কূপ ও দীঘি খনন করিয়েছিলেন। আর্ত ও পীড়িতের চিকিৎসার জন্য বহু দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়েছিলেন। চিকিৎসার সুবিধার জন্য বিদেশ থেকে ওষুধ, গাছ-গাছড়া আনাতেন। শুধু মানুষ নয়—জীবজন্তুর কষ্ট দূর করতেও তিনি চেষ্টা ত্রুটি করেনি। এজন্য তিনি বহু পশু-চিকিৎসালয় স্থাপন করান। অশোকের রাজ্যের সর্বত্র জীবহত্যা নিষিদ্ধ ছিল। শাস্তি দানের ব্যবস্থা শিথিল ছিল। তাঁর দূতেরা সেবাধর্মের পবিত্র আদর্শ প্রচার করতেন। জীবধর্ম নির্বিশেষে অভয়দান ও কল্যাণসাধনই অশোকের প্রচার-কার্যের মূল লক্ষ্য ছিল। প্রজাদের তিনি নিজের সন্তানের মতো ভালবাসতেন।

মৌর্য সম্রাট অশোক রাজা হয়েও ঋষির মত সরল ও পবিত্র জীবনযাপন করতেন। শুধু মানুষ নয়—সর্বজীবের কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁর জীবনের পবিত্র আদর্শ। এ কারণেই অশোককে বলা হয় রাজর্ষি। আনুমানিক ২৩২ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে অশোকের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পঁচিশ বছরের মধ্যেই মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল।

অশোকের মতো ধর্মপ্রাণ ও প্রজারঞ্জক সম্রাট পৃথিবীতে খুবই কমই জন্মগ্রহণ করেছেন।

অশোকের মৃত্যুর পরবর্তীকাল—অশোকের মৃত্যুর পরবর্তীকালে সুচতুর ও রণকুশলী নরপতির অভাবে ভারতে রাজনৈতিক অনৈক্য দেখা দেয়। শক, কুষাণ, গ্রীক ইত্যাদি জাতিগুলি ক্রমাগত ভারত সীমান্তে হানা দেয়। কিন্তু বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের তখন কোনরূপ সুব্যবস্থা ছিল না। এইসব বিদেশীদের মধ্যে ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে কুষাণরা সকলকে ছাড়িয়ে যায়।

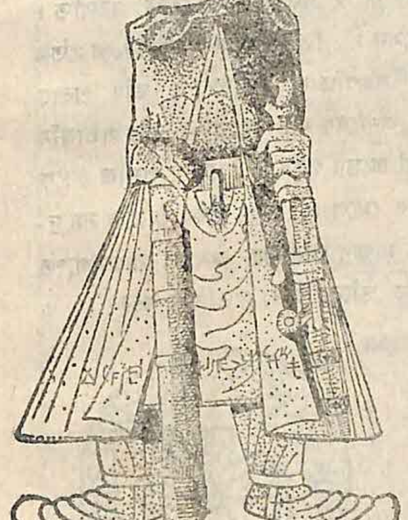
(খ) কুষাণ :

কুষাণরা ছিল চীনের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবাসী ইউ-চি জাতির একটি শাখা। ভারতে কুষাণ বংশের প্রতিষ্ঠাতা **কুজুল বা প্রথম কদফিস**। কুষাণরা প্রথমে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে শক ও বাহ্লিক গ্রীকদের প্রভাব নষ্ট করে।

কণিষ্ক—কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন কণিষ্ক। তিনি বোধহয় ৭৮ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। কণিষ্ক তাঁর বাহুবলে কাশ্মীর থেকে কাশী পর্যন্ত এক বিশাল অংশে কুষাণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি মধ্য-এসিয়ার তাসখন্দ, ইয়ারখন্দ ও খোটান জয় করে কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। কণিষ্কের সঙ্গে চীন ও রোমের কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় ছিল। কণিষ্কের সময়ে পুরুষপুর মৌর্য-রাজধানী পাটলিপুত্রের মতই সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, সুরম্য প্রাসাদ, স্তম্ভ ও সৌধের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল।

কণিষ্ক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। এই ধর্মের প্রচারে তিনি উদ্যোগী হন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধপণ্ডিত অশ্বঘোষ ছিলেন তাঁর প্রধান সভাসদ। তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই কাবুল, গান্ধার, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে বহু বৌদ্ধ স্তূপ ও সাংঘারাম প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে হূণ আক্রমণে সেগুলি বিধ্বস্ত হয়। কণিষ্কের রাজধানী ছিল পেশোয়ার। কিন্তু তিনি পুরুষপুরে থাকতেন। পুষপুর শিল্প-স্থাপত্যে খুবই সমৃদ্ধ ছিল। সেখানে তিনি একটি বিরাট চৈত্য নির্মাণ করান। মথুরার কাছে কণিষ্কের একটি ভগ্নমূর্তি পাওয়া গেছে। কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মধ্যকার বিরোধ ও অসঙ্গতি দূর করার উদ্দেশ্যে চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতি বা মহাসম্মেলন হয়। এতে সে-যুগের বহু বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত যোগদেন করেন। এই সম্মেলনের পরে বৌদ্ধধর্মে হীনযান ও মহাযান—এই দুটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। হিন্দুদের দেব-দেবীর ন্যায় বৌদ্ধ মূর্তি-নির্মাণ এবং মূর্তির পূজা মহাযানী বৌদ্ধদের মধ্যে প্রচলিত হয়। কণিষ্ক নিজে মহাযানী মতবাদের সমর্থক ছিলেন। তাঁর সময়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল—গান্ধার শিল্পের উদ্ভব।



কণিষ্কের ভগ্নমূর্তি

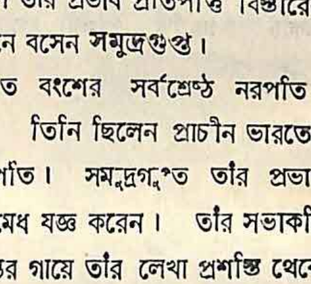
কণিষ্কের মৃত্যুর পরে উপযুক্ত রণদক্ষ রাজার অভাবে ধীরে ধীরে কুষাণ সাম্রাজ্য পতনের মুখে উপনীত হয়।

খ্রস্টীয় তৃতীয় শতকে কুষাণ বংশের পতন ঘটে। কুষাণ রাজারা বিদেশী হলেও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে তাঁরা নিজেদের একাত্ম করে ফেলেছিলেন। কিন্তু কুষাণদের পতনের পরে পুনরায় এক বিশৃঙ্খল অরাজক অবস্থা চলে। বিদেশী শত্রুরা বার বার হানা দেয়। এই বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করে ভারতব্যাপী রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুপ্তবংশীয় রাজাদের অবদান অসাধারণ।

(গ) গুপ্ত রাজবংশ :

খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকের সূচনায় **প্রথম চন্দ্রগুপ্ত** গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর সিংহাসনে আরোহণের সময়কালকে স্মরণীয় করার জন্য ৩২০ অব্দে গুপ্তাব্দ বা গুপ্ত সংবতের প্রবর্তন করেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মহিষী ছিলেন লিচ্ছবি-রাজকন্যা কুমার দেবী। এই বিবাহের ফলে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের পথ সুগম হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে সিংহাসনে বসেন **সমুদ্রগুপ্ত**।

সমুদ্রগুপ্ত—সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন গুপ্ত বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি ’৩০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন প্রাচীন ভারতের অন্যতম রণকুশলী সাম্রাজ্য-বিজেতা নরপতি। সমুদ্রগুপ্ত তাঁর প্রভাব বিস্তারের জন্য বৈদিক প্রথা অনুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তাঁর সভাকবি ছিলেন হরিষেণ। এলাহাবাদে একটি স্তম্ভের গায়ে তাঁর লেখা প্রশস্তি থেকে সমুদ্রগুপ্তের বিজয় অভিযানের বিবরণ মেলে। সমগ্র উত্তর ভারতে সমুদ্র-গুপ্তের একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। দক্ষিণ ভারতের অসংখ্য রাজা গুপ্ত সম্রাটের প্রভুত্ব মেনে নেন। পরে তিনি তাঁদের রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। এ ছাড়াও পশ্চিম ভারতের শক, কুষাণ এবং সিংহলরাজ মেঘবর্ণ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেন। সমতট (দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ), কামরূপ (আসাম), নেপাল, পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মালব প্রভৃতি রাজ্যগুলিও সম্রাটের সর্বময়প্রভুত্ব মেনে নিয়েছিল।



বীণা-বাদনরত সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা

সমুদ্রগুপ্তের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। তিনি তাঁর প্রতিভা শুধুমাত্র রাজ্যজয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি ছিলেন বিদ্বান, কাব্য

রসিক ও সংগীতানুরাগী। তাঁর সময়কার কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। তার একটিতে তাঁর বীণা বাদনরত মূর্তি আঁকা আছে।

সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন প্রজারঞ্জক সম্রাট ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব উদার ছিল। তিনি নিজে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুরাগী ছিলেন। তথাপি তিনি



সিংহলের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাজা মেঘবর্ণকে গয়ায় একটি সাংঘারাম প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়েছিলেন। এতে ধর্মীয় দিক থেকে তার উদারতারই পরিচয় মেলে। তাঁর উদারতার আর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত মেলে যখন দেখি বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত ও লেখক বসুবন্ধু তার সভা অলংকৃত করেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত—সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরে গুপ্ত বংশের সিংহাসনে বসেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। তিনি তাঁর বাবা সমুদ্রগুপ্তের মতই একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। পশ্চিম ভারতের শক, ক্ষত্রপদদের পরাজিত করে তিনি মালব, গুজরাট প্রভৃতি দেশ জয় করেন। শকদের পরাজিত করে তিনি 'শকারি' উপাধি গ্রহণ করেন।

তিনি বোধ হয় রূপকথার কাহিনীর 'বিক্রমাদিত্য'। তাঁর রাজসভা সে যুগের বিখ্যাত নবজন রত্ন বা নবরত্ন অলংকৃত করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে মহাকবি কালিদাস, জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট, বরাহমিহির প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র ও উজ্জয়িনী। প্রসিদ্ধ চীনা-পর্যটক ফা-হিয়েন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালেই ভারতে এসেছিলেন। পরে তিনি স্বদেশে ফিরে গিয়ে গুপ্ত রাজাদের রাজত্বকাল সম্বন্ধে একটি সুন্দর বিবরণী রচনা করেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর একে একে কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতি সম্রাটগণ সিংহাসনে বসেন। সে সময়ে শক, হূণ প্রভৃতি যাযাবর জাতির আক্রমণ তীব্র হয়ে ওঠে। বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করে দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধান কিংবা সুশাসনের বন্দোবস্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ ভাবে ধীরে ধীরে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

৭। প্রাচীন বাংলা দেশ :

বাংলা দেশের প্রাচীন কালের ইতিহাস অস্পষ্ট। কারণ প্রাচীনকালে এদেশের বিভিন্ন অংশ রাঢ়, সুহ্ম, বরেন্দ্রী, বঙ্গ, হরিকেল, গৌড় ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকে গৌড়রাজ শশাঙ্কের আগে অন্য কোন রাজা বাংলাদেশ জুড়ে একক প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারেননি। দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন বাংলাদেশ সম্বন্ধে জানার মত যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য নিদর্শনের অভাব রয়েছে। তথাপি যতটুকু নিদর্শন পাওয়া গেছে—তা থেকেও এদেশের প্রাচীনতা প্রমাণ করা যায়।

শিবালিক পাহাড় অঞ্চলে টারশিয়ারী নর-বানর গোষ্ঠীর মাথার খুলি, হাড়গোড় ইত্যাদি নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পুরানো পাথরের যুগের বহু অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। এসব নিদর্শন থেকে বাংলাদেশের প্রাগৈতিহাসিক যুগের পরিচয় মেলে।

ঋগ্বেদে বঙ্গ, মগধের অধিবাসীদের নিন্দাবাদ আছে। তারা খর্বকায়, নৈশ-আহারী আরও কত কি! এই উল্লেখ থেকে মনে হয় বঙ্গদেশের

আদিবাসীরা ছিল অনার্য। সেজন্যই আর্যরা তাদের প্রতি উপেক্ষা ও নিন্দাবাদ করেছে। সুতরাং এ থেকে আর্যদের ভারতে আসার আগে থেকেই বাংলাদেশে যে মানুষ ছিল—সেটাই প্রমাণিত হয়। এ ছাড়া বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থ বাংলাদেশের কোন কোন অংশের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ আছে। রামায়ণে দশরথের জামাতা লোমপাদের বাংলাদেশ থেকে হাতি সংগ্রহের কথা বর্ণিত আছে। মহাভারতে আছে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় বাংলাদেশের একজন রাজার উপস্থিতির উল্লেখ। এমনিভাবে মেলে বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রায় বিশ হাজার বছরের প্রাচীনতার প্রমাণ। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার বাংলাদেশের যুদ্ধহস্তি 'গংগারিড'-এর ভয়েই এদেশে সাম্রাজ্য প্রসারের প্রচেষ্টা থেকে সম্ভবতঃ নিবৃত্ত হয়েছিলেন। খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকে চীনা পর্যটক ফা-হিয়েনের বিবরণে বাংলাদেশের তাম্রলিপ্ত বন্দরের ঐশ্বর্যের উল্লেখ আছে। গুপ্তরাজ সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে বাংলাদেশের সমতটের উল্লেখ পাওয়া যায়। এত সব প্রমাণ একত্র করে এ কথাই বলা চলে, নর-বানরগোষ্ঠী থেকে পুরানো পাথরের যুগের মানুষ, বেদ থেকে রামায়ণ-মহাভারত, বৌদ্ধ-জৈন ধর্মগ্রন্থের রচনাকাল এবং আলেকজাণ্ডারের সময় থেকে গুপ্তযুগ অর্থাৎ অনাদি অতীতকাল থেকেই এদেশে মানুষ ছিল। যুগে যুগে ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ বাঙালীর মানসিক পরিমণ্ডল গঠনে বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি দান করেছে।

৮। ভারত ও মধ্য-এশিয়া : বৈদেশিক সম্পর্ক :

প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে কিভাবে পাঁচ হাজার বছরের পুরানো সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে—তার কথা তোমরা আগেই জেনেছ। স্যার অরেলস্টাইন নামে একজন প্রত্নতাত্ত্বিকের খননকার্যের ফলে মধ্য-এসিয়ার ইয়ারখন্দ, খোটান প্রভৃতি অঞ্চলেও প্রাচীন সভ্যতার বহু লুপ্ত নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে। খুব সম্ভব এই সব অঞ্চল কুষাণরাজ কণিষ্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এখানে পাওয়া নিদর্শনের মধ্যে আছে বুদ্ধের মূর্তি, স্তূপ, মন্দির, মুদ্রা আরও কত কি। পণ্ডিতদের ধারণা মধ্য এসিয়ার এই পথ ধরেই একদিন বিদেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় ছিল। পরবর্তীকালে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা মরুভূমির বালু চাপা পড়ে এই সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটেছিল।

৯। প্রাচীন ভারত সম্পর্কে বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী :

প্রাচীন ভারত সম্পর্কে জানবার জন্য বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী একটি প্রামাণ্য নিদর্শন। মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ভারতে এসেছিলেন গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিস। তিনি এদেশে বহুদিন ছিলেন। পরে স্বদেশে ফিরে গিয়ে তিনি ইণ্ডিকা নামে একটি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখেন। সেটি থেকে, খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষভাগ থেকে চতুর্থ শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত ভারতবাসীর জীবনধারা সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়।

(ক) মেগাস্থিনিসের বিবরণী : গ্রীকরাজ সেলুকস্ প্রেরিত দূত মেগাস্থিনিসের বিবরণী থেকে জানা যায় মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকে পূর্ণ। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য রাজধানীর চারদিকেছিল উঁচু কাঠের দেওয়াল, দেওয়াল ঘিরে ছিল গভীর খাল। রাজধানীর শাসনভার ন্যস্ত ছিল ত্রিশজন সদস্যের একটি কমিটির ওপর। এদের মধ্যে কেউ কারিগরদের কাজকর্ম দেখত, কারও ওপর দায়িত্ব ছিল হাটবাজার তদারকি করা, বিদেশীদের আদর-আপ্যায়নের দায়িত্ব ছিল আর একদলের ওপর। আবার কেউ রাখত জন্ম-মত্যুর হিসাব। সকলে মিলে রাস্তাঘাট, মন্দির, বাজার, বন্দর ইত্যাদির দেখাশুনা করত। সাম্রাজ্যে কাজকর্ম চালাবার জন্যও এভাবে দায়িত্বভার ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। শিল্প ও ব্যবসায়ের তদারকি, রাজস্ব আদায়, জমি জরিপ, খাল-খনন, রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি দায়িত্বভার বিভিন্ন অমাত্যের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল। সেনাবিভাগে ছিল কঠোর শৃঙ্খলা। গুপ্তচর বিভাগ ছিল সর্বদা সক্রিয়। সমস্ত খবরাখবর সংগ্রহ করে রাজা অতি সতর্কভাবে দেশশাসন করতেন। প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের দিকে ছিল তাঁর প্রখর দৃষ্টি। সম্রাটের শত্রু ছিল অনেক। তবুও সুশিক্ষিত চতুরঙ্গ সেনা, যার চার অংগ—অশ্বারোহী, গজারোহী, রথী এবং পদাতিক সৈন্য আর গুপ্তচরদের প্রখর নজর থাকায় বাইরের শত্রু হঠাৎ করে সাম্রাজ্যে হানা দিতে পারত না। অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরেও দেশদ্রোহীদের পক্ষে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ছিল খুবই কঠিন।

(খ) ফা-হিয়েনের বিবরণী—ফা-হিয়েন (৩৯৯-৪১৪ খ্রীস্টাব্দ) ছিলেন একজন চীনা বৌদ্ধ পর্যটক। তিনি চতুর্থ শতকের শেষভাগে গুপ্ত রাজাদের সময়ে ভারতে আসেন ও পঞ্চম শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত এদেশে অতিবাহিত করেন। তাঁর এখানে আসার উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ ধর্ম ও শাস্ত্র

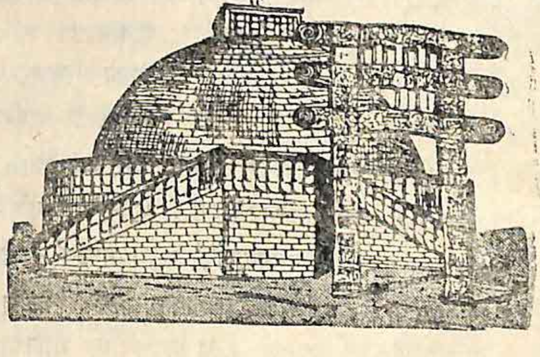
সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করা। সেজন্য তিনি এদেশে ছয় বছর কাটান ও নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান। বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করার পরে তিনি সিংহল ও যবদ্বীপ হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ভারত সম্বন্ধে একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেছিলেন। তা থেকে তৎকালীন গুপ্তযুগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়।

তখন ভারতবাসীর জীবন ছিল সুখ ও শান্তিতে ভরা। প্রজারা রাজ্যের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে পারত। কৃষক তার উৎপন্ন শস্যের এক অংশ রাজাকে খাজনা হিসেবে দিত। এতেই বোঝা যায় খাজনার হার ছিল অল্প। দোষ করলে দোষীর জরিমানা হতো। বারবার রাজবিদ্রোহী হলে শাস্তিস্বরূপ অপরাধীর ডান হাত কেটে দেওয়া হতো। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বজায় ছিল। দেশের বিভিন্ন স্থানে ছিল বহু মন্দির, অজস্র মঠ, পান্থশালা, হাসপাতাল ও বিদ্যালয়। পাটলিপুত্রের বৌদ্ধ মঠে দেশ-বিদেশের বৌদ্ধ ছাত্রেরা পড়তে আসত। সেযুগে বাংলা দেশের তাম্রলিপ্ত ছিল প্রসিদ্ধ বন্দর (বর্তমান তমলুক)। এখান থেকে পণ্যদ্রব্য নিয়ে সিংহল ও পূর্ব-এসিয়ায় জাহাজ যেত।

১০। প্রাচীকালে ভারতবাসীর বহুমুখী বিকাশ :

প্রাচীনকালে ভারতবাসী শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে অসাধারণ উন্নতি লাভ করেছিল। সেই যুগের শিল্প-স্থাপত্য, সাহিত্য, শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় তাদের বহুমুখী বিকাশ ঘটেছিল।

শিল্প-স্থাপত্য—মেগাস্থিনিস মৌর্য-রাজধানী পাটলিপুত্রের অপরূপ



সাঁচী স্তূপ

সৌন্দর্যময় রাজপ্রাসাদ দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। অশোকের সময় নির্মিত

স্তম্ভ ও বৌদ্ধ বিহারগুলি সেকালের শিল্প-স্থাপত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন। সাঁচীতে নির্মিত বৌদ্ধস্তূপটি কুষাণ যুগের শিল্প সৃষ্টির একটি অনবদ্য নিদর্শন। খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে কুষাণরাজ কণিষ্কের সময়ে শিল্প ও স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটে। একালের বৌদ্ধ বিহার, স্তূপ, বৌদ্ধ মূর্তি ইত্যাদি নির্মাণে তৎকালীন শিল্প-স্থাপত্যের সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়। কণিষ্কের রাজধানী পুরুষপুর নগরী ছিল বহু সৌধ, স্তম্ভ ও মঠের দ্বারা সুসজ্জিত। গ্রীক-রোমান শিল্পরীতির মিশ্রণজাত গান্ধার শিল্পের উদ্ভব কণিষ্কের যুগের শিল্পরীতির বিস্ময়কর অবদান। শিল্প-স্থাপত্যের বিকাশের দিক থেকে গুপ্ত যুগকে বলা হয় স্বর্ণযুগ। একালের পাথরের তৈরি সুন্দর সুন্দর মূর্তি এবং গুহায় অঙ্কিত চিত্রগুলিতে শিল্প-স্থাপত্যের চমৎকার নিদর্শন পাওয়া যায়। বিশেষ করে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের অজন্তা গুহায় বুদ্ধের জীবনী ও জাতকের কাহিনী নিয়ে আঁকা ছবিগুলি শিল্প-সুষমায় মণ্ডিত। সহস্র বৎসরের ব্যবধান সত্ত্বেও আজও তা সমানভাবে দর্শক চিত্তে সবিস্ময় কৌতূহল উদ্রেক করে।


অজন্তার গুহাচিত্র

সাহিত্য রাজাদের আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য প্রাচীন যুগে সংস্কৃত সাহিত্য বিকশিত হয়ে উঠেছিল। কুষাণরাজ কণিষ্কের রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন বুদ্ধচরিত গ্রন্থের রচয়িতা অশ্বঘোষ। তিনি খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের কবি। সংস্কৃত সাহিত্যের সুবর্ণযুগ বলা যায় গুপ্তযুগকে। ব্যাপক চর্চা ও অনুশীলনের জন্য এই সময়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য উন্নতির চরম শিখরে উন্নতী হয়। খ্রীস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকের কোন এক সময়েই বোধ হয় 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব' রচয়িতা মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাব। পণ্ডিতদের ধারণা, তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। নাট্যকার বিশাখ দত্তের লেখা মুদ্রারাক্ষস ও শূদ্রকের লেখা মৃচ্ছকটিক এই দুটি বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক এ যুগে রচিত হয়েছিল।

শিক্ষা-দীক্ষা—বৈদিক যুগে গুরুগৃহে গিয়ে ছাত্রেরা বিদ্যাশিক্ষা করত। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব এবং রাজ-রাজড়ার পৃষ্ঠপোষকতার ফলে বৌদ্ধ মঠ ও বিহারগুলি হয় শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্রস্থল। কোন বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে শিক্ষা-দীক্ষার চর্চা ও অনুশীলন হতো। সেই সব স্থানগুলি ধীরে ধীরে প্রধান বিদ্যাশিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়। সেদিক থেকে তক্ষশিলা ও নালন্দা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধদের প্রাচীন সাহিত্যে বলা হয়েছে, তক্ষশিলায় একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বহু দূর দেশ থেকে অসংখ্য ছাত্র এসে এখানে বেদ, যুদ্ধবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করত। তক্ষশিলার অনুরূপ বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হিসাবে নালন্দাও সমানভাবে প্রসিদ্ধ। বিহারের নিকটবর্তী পাটনার কাছাকাছি ছিল নালন্দা। এখানেও একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বহু দূর দূর দেশ থেকে বৌদ্ধ ধর্ম ও নানা বিষয়ে সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশের ছাত্রেরা এখানে আসত। এখানে ছাত্র ও শিক্ষকদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। বিভিন্ন সময়ে রাজানুগ্রহ লাভ করার জন্য নালন্দা বৌদ্ধধর্ম জগতে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিল। কোন্ সময়ে যে এই নালন্দার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে সপ্তম শতকে হর্ষবর্ধনের সময়ে ভারতে পর্যটনরত চৈনিক পর্যটক হিউ-এন্-সাঙের বিবরণীতে নালন্দার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা—প্রাচীনকালে ভারতবাসীর মধ্যে ব্যাপক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও অনুশীলন ছিল। বিশেষ করে জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, রসায়ন ও চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বৈদিক যুগ থেকেই ভারতে জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা ছিল। কিন্তু গুপ্তযুগে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার ব্যাপক অনুশীলন হয়। এ যুগের জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতির প্রমাণ করেন। তিনি বলেন, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলি সূর্যের চারদিকে পরিক্রমা করে। এ যুগের আর একজন জ্যোতির্বিদ ছিলেন ব্রহ্মগুপ্ত। তিনি খুব সম্ভব মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের উল্লেখ করেন।

বৈদিক যুগে যজ্ঞস্থলের পরিমাপ থেকেই বোধ হয় গণিতের জ্যামিতি (জ্যা—মাটি, মিতি—পরিমাণ) বিভাগের উদ্ভব হয়। গুপ্তযুগে গণিত-শাস্ত্র চর্চার অগ্রগতি ঘটেছিল।

মৌর্যযুগে পীড়িত ও আর্তের চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। ওষধি জাতীয় বৃক্ষ সংরক্ষণ করা হতো। কুষাণ রাজাদের আমলে আয়ুর্বেদ-

শাস্ত্রের পথদ্রষ্টা চরক ও শুশ্রুতের আবির্ভাব। দুটি উপাদানের মিশ্রণের দ্বারা ওষুধ প্রস্তু-প্রণালী থেকেই রসায়নশাস্ত্র অনুশীলনের সূচনা হয়। অন্যদিকে রোগের কারণ ও তার উপশমের দ্বারা রোগ সারানোর প্রচেষ্টা থেকেই চিকিৎসাশাস্ত্রের বিকাশ ঘটে। গুপ্ত রাজাদের আমলে ওষুধ প্রস্তুত-প্রণালীর আরও উন্নতি হয়। তারা পশুর মৃতদেহ কেটে অঙ্গব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা শিখত। কাঠের ছাঁচের মধ্যে মোম ঢেলে তারা মানুষের মূর্তি গড়ত এবং সেই মূর্তি কেটে প্রথম শিক্ষার্থীরা অংগব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা (Anatomy) শিখত। গাছ-গাছড়া, পারদ ও অন্যান্য ধাতু থেকে বিভিন্ন তৈরী করত। ভারতবাসী চিকিৎসা-বিদ্যায় এতই উন্নতিলাভ করেছিল যে, পরবর্তীকালে গ্রীক ও আরবগণও ভারতীয়দের কাছে এই শাস্ত্র শিখে এর উন্নতি সাধন করে।

গুপ্তযুগে ধাতুশিল্পের উন্নতির আরেকটি উদাহরণ—দিল্লীতে রাজা চন্দ্রের নাম খোদাই করা অপূর্ব একটি লৌহস্তম্ভ। এটি যে দেড় হাজার বছর আগের তৈরী তা দেখে মনে হয় না। আজও এর মসৃণতা একটুকুও নষ্ট হয় নি।

এই যুগে রোম, চীন, যবদ্বীপ, কম্বোজ, সুমাত্রা প্রভৃতি বিদেশের সঙ্গেও ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল।

অনুশীলনী

[ক] বড় প্রশ্ন

১। বৈদিক যুগ বলতে কি বোঝ? বৈদিক যুগের আর্যদের সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনধারার পরিচয় দাও।

২। মহাকাব্যের যুগ বলতে কোন সময়কে বোঝায়? তখন কি কি পরিবর্তন ঘটে?

৩। কখন ও কিভাবে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল। এই দুইয়ের মধ্যে পরবর্তীকালে কোনটি বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল?

৪। বুদ্ধের জীবনী ও ধর্মমত সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৫। মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? তার রাজত্বকাল সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৬। চণ্ডাশোক কেমন করে ধর্মাশোকে পরিণত হন।

৭। বৌদ্ধধর্মের প্রচারের জন্য অশোক কি কি করেছিলেন? তাঁর জন-হিতকর কার্যাবলী সম্বন্ধে কি জান?

৮। কুষাণরাজ কণিষ্কের রাজত্বকাল সম্বন্ধে একটি বিবরণ দাও।

৯। সাম্রাজ্য বিজেতা হিসাবে সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালের একটি বিবরণ দাও।

১০। বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রাচীনতা সম্বন্ধে তথ্যনির্ভর আলোচনা কর।

১১। মৌর্যযুগ ও গুপ্তযুগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মেগাস্থিনিস ও ফা-হিয়েনের বিবরণী থেকে কি কি জানা যায়?

১২। প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে কিরূপ উন্নতি ঘটেছিল?

[খ] ছোট প্রশ্ন

১। বেদ কি? বেদ কয় ভাগে বিভক্ত ও কি কি?

২। মহাবীরের জীবনী ও ধর্মমত সম্বন্ধে কি জান?

৩। অশোকের মৃত্যুর পরবর্তীকালে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে কি জান?

৪। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল সম্বন্ধে কি জান?

৫। মধ্য এসিয়ায় সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ সম্বন্ধে কেমন করে জানা গেছে?

৬। প্রাচান যুগে ভারতবাসী শিল্প-স্থাপত্য এবং শিক্ষা-দীক্ষায় কিরূপ উন্নত ছিল?

৭। প্রাচীন যুগে সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভারতবাসীর কিরূপ পরিচয় পাও?

[গ] বুদ্ধির প্রশ্ন :

১। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) আর্যেরা বিভিন্ন দেবতা ও —— শক্তির বন্দনার উদ্দেশ্যে পদ্যে —— বা —— রচনা করেন। (খ) —— রচনাকালীন সময়কে ভারতের ইতিহাসে বলা হয় বৈদিক ——। (গ) বাল্মীকি রচিত —— ও —— লেখা —— রচনাকালকে বলা হয় —— যুগ। (ঘ) ——ত্রিশ বৎসর —— জীবন যাপন করার পরে ঘর-ছাড়া হন। (ঙ) —— থেকেই সিদ্ধার্থ ছিলেন কিছুটা —— প্রকৃতির। (চ) মৌর্য সম্রাট —— ছিলেন সমরকুশলী ——। (ছ) —— যুদ্ধের মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে ——অতিশয় অভিভূত হন। (ঝ) ——ছিলেন গুপ্তবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ ——। (ঞ) স্যার——নামে একজন প্রত্নতাত্ত্বিকের——ফলে মধ্য এসিয়ার ইয়ারখন্দ, খোটান প্রভৃতি অঞ্চলেও —— ভারতীয় সভ্যতার বহু লুপ্তদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে। (ট) বৌদ্ধদের প্রাচীন সাহিত্যে বলা হয়েছে,— একটি বিখ্যাত ছিল।

২। নীচের উক্তিগুলির ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে হ্যাঁ (✓) বা না (×) চিহ্নিত কর।

উক্তি	চিহ্ন দাও
(ক) ব্যাসদেবের লেখা মহাভারত ও বাল্মীকির লেখা রামায়ণ।	(ক) ……
(খ) গুপ্ত বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত।	(খ) ……
(গ) 'বুদ্ধচরিতের' রচয়িতা ছিলেন মহাকবি কালিদাস।	(গ) ……

(ঘ) ফা-হিয়েন ছিলেন চৈনিক বৌদ্ধ পর্যটক। (ঘ) ......

(ঙ) পুরুষপুর ছিল মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী। (ঙ) ......

(চ) সেলুকস্ ছিলেন গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের অন্যতম সেনাপতি। (চ) ......

(ছ) আর্যভট্ট ছিলেন গুপ্তযুগের একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ। (ছ) ......

(জ) চরক ছিলেন মৌর্যযুগের একজন আয়ুর্বেদিক। (জ) ......

৩। যথার্থ উত্তরটি খুঁজে (√) চিহ্নিত কর:

প্রশ্ন	উত্তর
(ক) মহাকবি কালিদাস ছিলেন—	(ক) সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি / কণিষ্কের সভাকবি / ২য় চন্দ্রগুপ্তের সভাকবি।
(খ) মেগাস্থিনিস ছিলেন—	(খ) চৈনিক পর্যটক / গ্রীক পর্যটক / রোমান পর্যটক /
(গ) মৃচ্ছকটিক নাটকের রচয়িতা	(গ) শূদ্রক / কালিদাস / অশ্বঘোষ /
(ঘ) পাটলিপুত্র রাজধানী ছিল—	(ঙ) মৌর্য সম্রাট অশোকের / সমুদ্রগুপ্তের / কণিষ্কের
(ঙ) 'শকারী' উপাধি ছিল –	(ঙ) কণিষ্কের / সমুদ্রগুপ্তের / দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের

৪। মৌখিক প্রশ্ন:

(ক) বেদ শব্দের অর্থ কি? (খ) 'হিন্দু' শব্দটি উদ্ভব হয়েছে কেমন করে? (গ) বুদ্ধ শব্দের অর্থ কি? (ঘ) 'জিন' শব্দের অর্থ বল? (ঙ) অশ্বঘোষ কে ছিলেন? (চ) কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কে? (ছ) চরক কে? (জ) জরথুস্ত্র কে? (ঝ) গুপ্ত বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কে? (ঞ) ইণ্ডিকা কি? (ট) মধ্যপন্থা বলতে কি বোঝ? (ঠ) বৌদ্ধদেবের ধর্মগ্রন্থের নাম বল। (ড) বেদের কয়টি অংশ ও কি কি? (ঢ) ফা-হিয়েন কখন ভারতে আসেন? (ণ) তাম্রলিপ্ত কোথায় ছিল? (ত) বিন্দুসার কে ছিলেন?

৫। প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি মানচিত্র অঙ্কন করে নীচের স্থানগুলির অবস্থান নির্দেশ কর—

আর্যাবর্ত, পাটলিপুত্র, তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী, গঙ্গা নদী, সিন্ধু নদ, বিন্ধ্য পর্বত, পুরুষপুর, প্রাচীন বাংলাদেশ।